আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

অষ্টম শ্রেণি

সংকলন ও সম্পাদনা

প্রফেসর ফাতেমা চৌধুরী
প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান
প্রফেসর জিয়াউল হাসান
নুরুন নাহার
মতিউর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৬

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ :

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

ছবি অঙ্কন

আহ্‌মদ উল্যাহ

কম্পিউটার কম্পোজ

গ্রাফিক জোন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ –কথা

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর এ উন্নয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন চলমান প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক ও সহপাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ সময় ধরে সহপাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা সহপাঠ্যপুস্তক 'আনন্দপাঠ' নামে সংস্কার ও নবায়ন করা হয়েছে। এ নবায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বদাই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগা, আনন্দলাভ ও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ–সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও নানাসূত্রে যেন তাদের পরিচয় ঘটে, সে দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বিশ্বসাহিত্য থেকে আটটি কাহিনী সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিরায়ত জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না সে দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষাগত সহজ সাবলীলতা ও গতিশীলতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধিজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হলো, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১.	কিশোর কাজি	(আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে)	১
২.	রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে	মার্ক টোয়েন	৬
৩.	রবিনসন ক্রুশো	ড্যানিয়েল ডিফো	২০
৪.	সোহরাব রোস্তম	মূল : মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী রূপান্তর : মমতাজউদদীন আহমদ	২৯
৫.	মার্চেন্ট অব ভেনিস	উইলিয়াম শেক্সপিয়ার	৪০
৬.	রিপভ্যান উইংকল	ফখরুজ্জামান চৌধুরী (ওয়াশিংটন আরভিং রচিত গল্প অবলম্বনে)	৪৯
৭.	সাড়ে তিন হাত জমি	মূল : লেভ তলস্তয় রূপান্তর : প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান	৫৭

কিশোর কাজি

(আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে)

খলিফা হারুন–অর–রশীদের শাসনকালে বাগদাদে আলী কোজাই নামে এক বণিক বাস করত। সারা জীবন পরিশ্রম করে সে অনেক টাকা সঞ্চয় করেছিল। তারপর একবার কয়েকজন প্রতিবেশী মক্কায় হজ করতে যাবে শুনে তারও মক্কা যাবার খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু সঞ্চিত অর্থগুলো কোথায় নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবে সে নিয়ে

হলো সমস্যা। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বলল, অর্থগুলো খলিফার নিকট রেখে যাও। আবার কেউ বলল, কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে রেখে গেলেই হয়। এসব শুনে অনেক চিন্তাভাবনা করে আলী একটি বড় কলসি কিনল। মক্কায় যাবার খরচ বাদে বাকি সমস্ত অর্থ কলসিতে রেখে সেটা জলপাই দিয়ে পূর্ণ করল। তারপর পাশের বাড়িতে বিশ্বস্ত বন্ধু নাজিমের নিকট গিয়ে কলসিটি আমানত রেখে এল এবং বলল, তুমি যদি আমার জলপাইয়ের কলসি রাখো খুবই উপকার হবে। আমি কিছুদিনের জন্য মক্কায় যাচ্ছি। নাজিম বলল, এ সামান্য বিষয় নিয়ে ভাববার কী আছে। তুমি কলসিটি এখানে রেখে নিশ্চিন্ত মনে মক্কা শরিফ যেতে পারো। এই বলে খুশিমনেই বন্ধু নাজিম আলীকে নিশ্চিন্ত করে বিদায় দিল। আলী অন্যদের সাথে মক্কায় রওনা হলো।

প্রায় দুবছর চলে গেছে এখনো আলী ফিরে আসেনি। একদিন নাজিমের স্ত্রী ও নাজিম খেতে বসেছে। প্রসঙ্গক্রমে তার স্ত্রী বলল, তার খুব জলপাই খেতে ইচ্ছে করছে। এখানে কোথাও জলপাই পাওয়া যাবে কি?

নাজিম বলল, কেন, আমাদের ঘরেই তো জলপাই আছে। সেই যে বন্ধু আলী এক কলসি জলপাই রেখে গেছে তা থেকে কয়েকটা নিলেই তো হয়।

স্ত্রী বাধা দিয়ে বলল, কী দরকার পরের আমানতের জিনিসে হাত দেওয়ার? তুমি বরং বাজার থেকেই কিনে আনো।

নাজিম বলল, দুবছর হলো আলী গেছে। এখনো তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। জীবিত আছে কি না কে জানে? এগুলো খরচ করে নতুন জলপাই এনে না হয় কলসিটি ভরে রাখলেই হবে।

একথা শুনে স্ত্রী আর অমত করল না । নাজিম তখন ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করল এবং কলসির মুখ খুলে দেখল সবগুলো জলপাই পচে গেছে। নিচে ভালো থাকতে পারে ভেবে সে কলসিটি উপুড় করে ঢেলে দিল।

কিন্তু এ কী! জলপাই কোথায়? এ যে রাশি রাশি সোনার মোহর!

নাজিম খুশিমনে সমস্ত মোহর ঢেলে তার সিন্দুকে তুলে রেখে দিল। তারপর বাজার থেকে এক ঝুড়ি টাটকা জলপাই কিনে নিয়ে কলসিতে ভরে রাখল।

কদিন পর আলী মক্কা থেকে ফিরে এল এবং বন্ধুর বাড়ি গেল। বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার শেষে বন্ধুর নিকট থেকে কলসিটি চেয়ে বাড়ি নিয়ে চলে গেল। বাড়ি গিয়ে আলী দেখল কলসিতে একটি মোহরও নেই, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শুধু টাটকা জলপাইয়ে ভর্তি।

বিষণ্ন মনে আলী আবার নাজিমের কাছে গিয়ে মোহরগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। নাজিম বিস্ময়ের ভান করে বলল, সে কী বন্ধু! তুমি আমার কাছে জলপাই রেখে গেলে। এখন মোহর চাচ্ছ, ব্যাপার কী?

আলী তখন বন্ধুর নিকট পুরো ঘটনা খুলে বলল এবং মোহরগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার তাকে অনুরোধ করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বহু অনুনয় করা সত্ত্বেও মোহরগুলো ফিরিয়ে দিতে নাজিম রাজি হলো না। অগত্যা আলী কাজির দরবারে গিয়ে নালিশ জানাল। কাজির তলবে নাজিম বিচারালয়ে হাজির হলো।

কাজি প্রশ্ন করলেন, তুমি আলীর গচ্ছিত কলসিটি ফিরিয়ে দিলে, ওর ভিতরের মোহরগুলো দিচ্ছ না কেন?

নাজিম বলল, হুজুর ও আমার কাছে এক কলসি জলপাই গচ্ছিত রেখেছিল, তা তো পেয়েছেই। আমি তো কলসির মুখ খুলিনি, কী করে জানব ওতে কী ছিল।

কাজি বলল, আলী, তুমি যদি প্রমাণ দিতে পারো যে, তোমার কলসিতে জলপাইয়ের নিচে মোহর রেখেছিলে, তবে অবশ্যই তা পাবে।

কিন্তু আলী কীভাবে প্রমাণ করবে যে, তার কলসির ভেতর জলপাইয়ের নিচে মোহর রেখেছিল। তা তো আর কেউ জানে না। কাজেই হতাশ হয়ে ফিরতে হলো।

কিছুদিনের মধ্যে সারা বাগদাদে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন খলিফা হারুন–অর–রশীদ নিজ অভ্যাসমতো উজিরের সাথে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। জোছনার আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল। খলিফা ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন একস্থানে কতকগুলো বালক চাঁদের আলোয় বসে খেলা করছে। কৌতূহলী খলিফা সেখানে দাঁড়ালেন।

বালকের মধ্যে একজন বলল, ভাই, চলো আজ আমরা আলী ও নাজিমের বিচার খেলি। তখন তাদের মধ্যে একজন আলী ও একজন নাজিম সাজল। একজন আলী সেজে একটি ভাঙা কলসিতে কতকগুলো মাটির ঢেলাপূর্ণ জলপাইয়ের কলসি তৈরি করল। বিচার আরম্ভ হলে আলী নালিশ করল। কাজি নাজিমকে হাজির করে জিজ্ঞেস করল, আলী যা বলেছে তা কি সত্য? নাজিম বলল, হুজুর জলপাইয়ের কথা সত্য, তবে মোহরের কথা মিথ্যা। কাজি বলল, আচ্ছা কদিন আগে কলসিটি দিয়েছিল?

নাজিম বলল, তা প্রায় দুই বছর হবে।

কাজি বলল, বেশ, তখন কলসিতে কি এই জলপাই ছিল?

নাজিম বলল, হ্যাঁ হুজুর ছিল। কিন্তু আমি তা ছুঁইনি।

কাজি তখন একজন বালককে বলল, যাও তো একজন জলপাই ব্যবসায়ী ডেকে নিয়ে এসো। তখন একজন বালক জলপাই ব্যবসায়ী সেজে কাজির সামনে এসে দাঁড়াল। কাজি বলল, আচ্ছা জলপাই কত দিন পর্যন্ত ভালো থাকে বলো তো?

ব্যবসায়ী বলল, যত্নে রাখলে বড়জোর ছয় মাস টাটকা থাকে।

কাজি তখন সেই কলসিটি দেখিয়ে বলল, এই জলপাইগুলো দ্যাখো তো কত দিনের?

ব্যবসায়ী পরীক্ষার ভান করে বলল, হুজুর, বেশি হলে এক মাস আগে এগুলো গাছ থেকে পাড়া হয়েছে।

কাজি তখন নাজিমকে বলল, সব তো শুনলে। তুমি ভীষণ মিথ্যাবাদী। নিশ্চয়ই তুমি কলসির ভিতরের মোহরগুলো নিয়ে নতুন জলপাই দিয়ে কলসিটি ভর্তি করে রেখেছিলে। অতএব এখনই আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দাও। অন্যথায় তোমায় বন্দি করব।

নাজিম তখন সব স্বীকার করে আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দিল।

বালকের বিচারক্ষমতা দেখে খলিফা ও উজির বিস্মিত হলেন এবং বালকদের অনেক পুরস্কার দিলেন।

খলিফা বালকদের বললেন, বালকেরা তোমরা আগামী দিন আমার বিচারালয়ে গিয়ে আলী ও নাজিমের বিচারটি করবে।

বালকেরা আনন্দিত মনে রাজি হলো।

পরদিন সকালে বালকদের বিচার দেখতে বিচারালয়ে অনেক মানুষের ভিড় হলো। খলিফা আলী ও নাজিমকে তাঁর দরবারে ডাকলেন এবং সেই বালকদেরও নিয়ে এলেন। যথা নিয়মে সে বালক কাজির আসনে বসে বিচার করতে আরম্ভ করল। গত রাতের মতোই সে সঠিকভাবে বিচার করে নাজিমকে দোষী সাব্যস্ত করল।

তখন নাজিম বাধ্য হয়ে তার সকল অপরাধ স্বীকার করল এবং আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দিল। দরবারসুদ্ধ সব মানুষ তখন সেই বালকের প্রশংসা করতে লাগল।

খলিফা তখন খুশি হয়ে সেই বালকের শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন এবং বড় হলে তাকে কাজির পদ প্রদান করে পুরস্কৃত করলেন।

সার–সংক্ষেপ

খলিফা হারুন–অর–রশীদের শাসনকালে বাগদাদে আলী কোজাই নামে এক বণিক বাস করত। সে হজ্জ্বব্রত পালনের জন্য মক্কায় যাওয়ার সময় তার সারাজীবনের সঞ্চয় একটি কলসিতে লুকিয়ে তার বন্ধু নাজিমের কাছে রেখে যায়। কলসির নিচে মোহর লুকিয়ে উপরে জলপাই দিয়ে তা ঢেকে রাখে এবং বন্ধুকে জলপাইয়ের কলসি বলেই উল্লেখ করে।

অনেক দিন হয় বন্ধু ফিরে না আসায় নাজিম খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে। এর মধ্যে একদিন তার স্ত্রী জলপাই খেতে চাইলে সে বন্ধুর কলসি থেকে জলপাই আনতে যায় এবং ভাবে পরে নতুন জলপাই কিনে কলসিতে রেখে দেবে।

জলপাই আনতে গিয়ে সে দেখে কলসির নিচে সোনার মোহর। তার মাথায় দুস্টবুদ্ধি আসল। সে সব সোনার মোহর নিয়ে সিন্দুকে লুকিয়ে রাখল এবং কলসি নতুন জলপাই দিয়ে ভরে রাখল।

কয়েক দিন পর আলী কোজাই ফিরে এসে নাজিমের কাছ থেকে কলসি নিয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে সে দেখে সোনার মোহর নেই। সে নাজিমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, মোহরের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না।

আলী কোজাই নিরুপায় হয়ে কাজির দরবারে নালিশ করল। বন্ধু নাজিম কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কাজির প্রশ্নের জবাবে বলে, আলী কোজাই তার কাছে জলপাইয়ের কলসি রেখে গেছে এবং সে জলপাইয়ের কলসি ফেরত দিয়েছে। সোনার মোহরের ব্যাপারে সে কিছু জানে না।

আলী কোজাই তার পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে না পারায় মোহর ফেরত পেল না। সে হতাশ হয়ে পড়ল। এ ঘটনার কথা সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ল।

একরাতে খলিফা হারুন–অর–রশীদ ছদ্মবেশে বেড়াতে বেরিয়ে দেখলেন কয়েকজন বালক মিলে আলী কোজাই ও নাজিমের বিচারের খেলা খেলছে। খলিফা মনোযোগ সহকারে বিচারকাজ দেখলেন। একটি বালক কাজি সেজে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করে আলীকে তার সোনার মোহর ফেরত দিল।

বিচার দেখে খলিফা বিস্মিত হলেন এবং পরদিন বালকদের খলিফা তার দরবারে বিচারকার্যে বসালেন এবং কাজি–সাজা বালককে দিয়ে বিচারকাজ পরিচালনা করে আলী কোজাইকে তার সোনার মোহর ফেরত দিলেন।

শব্দার্থ

জলপাই – এক জাতীয় ফল।

সঞ্চয় – জমা।

মক্কা – মুসলমানদের পবিত্র স্থান, এখানে কাবা শরিফ অবস্থিত।

বিশ্বস্ত – যাকে বিশ্বাস করা যায়, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

সোনার মোহর – সোনার টাকা (প্রাচীনকালে সোনার টাকার প্রচলন ছিল)

বিষণ্ন – দুঃখিত, বিবর্ণ।

গচ্ছিত – দায়িত্ব নিয়ে রক্ষিত।

বিস্মিত – অবাক, চমৎকৃত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হারুন–অর–রশিদ কোথাকার শাসক ছিলেন?

ক. বাগদাদের খ. ইরানের

গ. বাহরাইনের ঘ. সৌদি আরবের

২. খলিফা বালকদের খেলা থেকে কী শিখেছিলেন?

ক. শাস্তি প্রদানের কৌশল খ. বিচার করার কৌশল

গ. সত্য উদ্‌ঘাটনের কৌশল ঘ. রায় দেওয়ার কৌশল

৩. নাজিম হলো–

i. নিষ্ঠুর ও নিপীড়ক

ii. লোভী ও স্বার্থপর

iii. বিশ্বাসঘাতক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আলী কোজাই নামে বাগদাদে এক লোক বাস করত। সে হজব্রত পালনের জন্য মক্কায় যাবার সময় জীবনের সঞ্চয় কলসিতে লুকিয়ে তার উপরে জলপাই ভরে বন্ধু নাজিমের কাছে রেখে গেল। আলী কোজাই ফিরে এসে বন্ধু নাজিমের কাছ থেকে কলসি নিয়ে গিয়ে দেখল তাতে মোহর নেই, শুধু জলপাই আছে। আলী তখন কাজির দরবারে নালিস করলে কাজি নাজিমকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে নাজিম তার কলসি যথা নিয়মে ফেরত দিয়েছে বলল। আসলে আলীর সেই সঞ্চিত ধন অর্থাৎ মোহরগুলো পেয়ে নাজিম সিন্দুকে ভরে রেখে দিল।

ক. গল্পাংশ কোন দেশের পটভূমিতে রচিত?

খ. আলী মূল্যবান মোহরের উপর জলপাই রাখল কেন?

গ. উদ্দীপকে বন্ধুর প্রতি নাজিমের আচরণের যৌক্তিকতা তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আলী ও নাজিম চরিত্রের তুলনামূলক মূল্যায়ন কর।

রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে

মার্ক টোয়েন

ষোড়শ শতাব্দীতে লন্ডনের এক বস্তিতে টম ক্যান্টি নামে একটি ছেলের জন্ম হলো। তার বাবামায়ের মুখে হাসি নেই। কারণ তারা খুব দরিদ্র। তাদের চিন্তা বাড়ল এই ভেবে যে, আরও একটা মুখে খাবার জোটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর ঠিক একই সময়ে একই দিনে ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড টিউডরের ঘরে একটি ছেলের জন্ম হলো। এই ছেলের জন্মে রাজ্যময় খুশির ঢেউ বইল এবং নানা আনন্দ–উৎসবের আয়োজন হলো।

রাজকুমার বিজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাশিক্ষা নিতে লাগলেন আর বস্তির ছেলে টম বস্তির লোকের কাছ থেকে ভিক্ষা করার শিক্ষা নিল। তবে সে এক ধর্মযাজক ফাদার এন্ড্রুর কাছে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখছিল। বিশেষ করে ল্যাটিন শিখছিল। টম ছিল কল্পনাবিলাসী, সে সবসময় রাজা আর রাজকুমারদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। সে যতই রাজকীয় কল্পনাতে ডুবে থাকত ততই সবার উপহাসের পাত্র হতো। তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে সে রাজকুমার নামেই পরিচিত হতে চাইত। সেজন্য তাদের নিয়ে রাজকীয় সভার অনুসরণ করে নিজে রাজা হতো এবং অন্যদের উপাধি বণ্টন করত। ছেলেমেয়েরাও তার এই পাগলামি খেলা উপভোগ করত এবং আনন্দ পেত। সে মনে মনে ভাবত : আহা সত্যিকার রাজকুমারের যদি দেখা পেতাম!

একদিন সে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে এক অচেনা জায়গায় এসে গেল। সেখানে সে বিরাট বিরাট অট্টালিকা দেখল। এই অট্টালিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ওয়েস্টমিনস্টারস প্যালেসে সে এলো। এসে মনে মনে ভাবল, এত বড় অট্টালিকা নিশ্চয়ই কোনো রাজপ্রাসাদ হবে। এমন সময় গেটের ফাঁক দিয়ে সে তার বয়সী এক বালককে সুন্দর পোশাক পরা অবস্থায় দেখতে পেল। তখনই সে মনে মনে ভাবল, এ নিশ্চয়ই সত্যিকারের রাজকুমার হবে। ঠিক এমনি সময় পেছন থেকে তার ঘাড়ে এক পদাঘাত এল। বস্তুত এই পদাঘাতটি ছিল দারোয়ানের। সে বলল, এই ভিখারির বাচ্চা, সরে পড়। কোন সাহসে এখানে এসেছিস? অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে গেটের ভিতরের রাজকুমারের নজরে সমস্ত ব্যাপারটা পড়ে গেল। রাজকুমার চিৎকার করে বলে উঠলেন দারোয়ান, আমার বাবার গরিব প্রজার সঙ্গে এমন জঘন্য ব্যবহার করতে তুমি কী করে সাহস পেলে? এখনই দরজা খুলে এই বালককে আমার কাছে নিয়ে এসো।

ভিতরে ঢোকার পর রাজকুমার বললেন, তুমি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত এবং তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে! তুমি আমার সঙ্গে এসো।

কথাটা যেন টমের বিশ্বাস হতে চায় না। সে বলল, ঠিক বলছেন তো স্যার, আপনার সঙ্গে আসব?

রাজকুমার অভয় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

টম রাজকুমারের সাথে ভিতরে গেল। দুজনে অনেক গল্প হলো। রাজকুমার টমকে রাজপ্রাসাদ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালেন। টমের কাছে সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। সে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে কি সবসময় এই সুন্দর পোশাক পরে থাকতে হয়?

নিশ্চয়ই।

আপনার জীবন কি সুখের!

আর রাজকুমার শুনল টমের বস্তি জীবনের কথা।

সে বলল, যেকোনো সময় নদীতে সাঁতার কাটা যায়, কাদা নিয়ে খেলা করা যায়, একে অন্যের দিকে কাদা ছুড়ে মেরে মজা করা যায়।

তখন রাজকুমার বললেন, তোমার জীবনও নিশ্চয়ই আনন্দ আর খুশিতে ভরা। আহা! আমি যদি তোমার পোশাক পরে কাদায় খেলা করতে পারতাম, তাহলে কী আনন্দটাই না পেতাম!

টম বলল, আর আমি যদি আপনার পোশাক পরতে পারতাম, তাহলে কী আনন্দই না পেতাম!

রাজকুমার বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমরা পোশাক বদল করতে পারি। তারপর তারা উভয়ে পোশাক বদল করে নিল।

তারা উভয়ে একে অপরের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল, কারণ তাদের চেহারা ও পোশাকে কে যে ভিখারির ছেলে আর কে যে রাজকুমার তা কেউ চিনে বের করতে পারবে না। কারণ তাদের দুজনের চেহারা

দেখতে হুবহু এক। শুধু পোশাক দ্বারা তাদের ভিন্ন করা যায়। টমের হাতের আঘাত পরীক্ষা করে রাজকুমার বললেন, উহ্! তোমার নিশ্চয়ই খুব লেগেছিল? টম বলল, না, ও কিছু নয়। আমি এমনি আঘাত আর মার খেয়ে অভ্যস্ত। যে দারোয়ান টমকে মেরেছিল তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভিক্ষুকের পোশাকে রাজকুমার বাড়ির গেটের দিকে গেলেন ও চিৎকার করে বললেন, দরজা খোলো। দারোয়ান তার কথামতো দরজা খুলে দিল।

রাজকুমার যেইমাত্র দরজার বাইরে বেরিয়েছেন অমনি দারোয়ান তাকে কষে এক চড় দিয়ে বলল, হে ভিখারির ছেলে, আমাকে রাজকুমারের হাতে বকা খাওয়ানোর জন্য এটা তোর বখশিশ। ভিখারির পোশাকে রাজকুমার মাটিতে পড়া অবস্থায় বললেন, বদমাইশ, আমি হচ্ছি রাজকুমার এডওয়ার্ড আর রাজকুমারের গায়ে হাত তোলা মস্ত অপরাধ। তখন দারোয়ান বলল, দূর হ ভিখারি, এখান থেকে। এই সময় রাস্তার লোকজনও তাঁকে মারল।

তাদের হাত থেকে অনেক কষ্টে বের হয়ে রাজকুমার একা একা পথ চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক সময় তিনি এক অচেনা পথে চলে এলেন। এখানে তিনি একটা ছোট ছেলেমেয়েদের হোস্টেল দেখলেন। তখন তাঁর মনে হলো যে, এই হোস্টেল নির্মাণ করেছেন তার বাবা। তাই তিনি সাহস করে হোস্টেলের ভিতর ঢুকে বললেন, হে কিশোররা, আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। তোমরা ভিতরে গিয়ে বসো ও অন্যদের বলো যে, রাজকুমার এডওয়ার্ড তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান।

সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশ মজা পেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ছেলেটা নিশ্চয়ই পাগল হবে। ঠিক আছে, আমরা সবাই তাকে রাজকুমার মনে করে সম্মান দেখাই। দেখা যাক ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। তাই সবাই হাঁটু গেড়ে বসে রাজকুমারকে সম্মান দেখাল। তারপর সবাই তাঁকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে সামনের পুকুরে ছুড়ে ফেলল। রাজকুমার আবার সবার হাতে অপমানিত হলেন।

পুকুর থেকে উঠে তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন। দিন শেষে রাত্রি ঘনিয়ে এল। তখন রাজকুমার ভাবলেন: আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। আমার একমাত্র উপায় হলো টমের বাড়ি খুঁজে বের করা। তাহলে তার পিতা–মাতা আমার প্রাসাদের দারোয়ানের কাছে গিয়ে বললেই হয়তো আমার এই বিপদ কেটে যাবে।

তারপর তিনি নিকটস্থ বস্তি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বলিষ্ঠ হাত তার হাত ধরল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, বাঁচাও বাঁচাও! সেই হাতের অধিকারী তখন বললেন, এই বদমাইশ, চিৎকার করছিস কেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলি? তোর হাড়গুলি সব পিটিয়ে ভাঙব– না হলে আমার নাম জন ক্যান্টিই নয়। রাজকুমার তখন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইশ, কী সৌভাগ্য আমার! তাহলে তুমিই তার বাবা? লোকটা বললেন, কী বলিসরে ছোকরা? আমি তার বাবা নই, আমি তোর বাবা। রাজকুমার বললেন, মহাশয় আমার সঙ্গে দয়া করে তামাশা করবেন না। আমি বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে আমার প্রাসাদের দারোয়ানকে যদি আপনি বলে দেন যে, আমি আপনার ছেলে নই, আমি রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েলস। এ–কথা শোনার পর লোকটা বললেন, প্রিন্স অব ওয়েলস, পাগল, তোকে বেত দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করতে হবে। তাহলেই তোর পাগলামি ছুটবে। তারপর টমের বাবা তাকে খুব মারতে লাগলেন। আর রাজকুমার চিৎকার করতে লাগলেন, আমাকে যেতে দাও, আমি তোমার ছেলে নই। আমি রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েলস।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে ফাদার এন্ড্রুকে দেখা গেল। তিনি এসে বললেন, থামো ছেলেকে মেরো না, সে অসুস্থ। সে তো তোমার কোনো ক্ষতি করছে না। জন ক্যান্টি তখন রাগের মাথায় ফাদারকে এক ঘা বসিয়ে দিলেন ও রাজকুমারকে বাড়ির উপরতলায় পাঠিয়ে দিলেন। তার কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়ির উপরতলায় এসে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তোর নাম কী? রাজকুমার উত্তর দিলেন, আমি তো তোমায় আগেই বলেছি যে আমার নাম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস। টমের মা তখন আফসোস করে বলে উঠলেন, টম তুমি যে বই নিয়ে পড়াশোনা

করেছ, তাতেই এটা হয়েছে। রাজকুমার বললেন, আমি আপনাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য দুঃখিত। তবে আমি জীবনে আপনাকে আর কখনো দেখিনি। এ–কথা শুনেই টমের বাবা বেত দিয়ে রাজকুমারকে খুব মারলেন। রাজকুমার তার রাজকীয় কায়দায় যতই বড় বড় কথা বলেন তার বাবা ততই তাকে মারেন। অবশেষে টমের বাবা ক্লান্ত হয়ে রাজকুমারকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন।

ক্লান্ত রাজকুমার খড়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন। টমের মা লক্ষ করলেন যে টম তার হাত মাথার উপর রেখে ঘুমায়নি। মাথার উপর হাত রেখে ঘুমানোটা টমের অনেক দিনের অভ্যাস। তাই তিনি রাজকুমারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজকুমার তার হাত মাথায় নিয়ে গেলেন না। এমনিভাবে রাতে তিনি তিনবার এ–কাজটি করলেন। তবু তিনি স্থির করতে পারলেন না। টমের মায়ের মনে যে সন্দেহ হয়েছিল তা তিনি জোর করে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি ভাবলেন, মাথায় গোলমাল হবার জন্য বোধ হয় তার পুরোনো অভ্যাসটা বদলে গেছে। এদিকে বেশ গভীর রাতে খবর এল যে ফাদার এন্ড্রুকে টমের বাবা যে আঘাত করেছিল তার ফলে তিনি মরতে বসেছেন। টমের বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পালানোর কথা স্থির করে ফেললেন। তিনি তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন– আমি আর টম এখনই চলে যাচ্ছি। তুমি এসে লন্ডন ব্রিজের কাছে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তারপর রাজকুমারকে নিয়ে জন ক্যান্টি পথে বেরিয়ে দেখতে পেলেন এক বিরাট উৎসব মিছিল। পথে উৎসবরত লোকেরা তাকে পান করার জন্য পানীয় দিল। জন ক্যান্টি রাজকুমারকে ছেড়ে যেইমাত্র হাত উপরে তুললেন, এই সুযোগে রাজকুমার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। তারপর রাজকুমার খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে রাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষে এই উৎসব হয়েছে। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন: টম ক্যান্টি কি তাকে ফাঁকি দিল? কিন্তু মনে মনে তিনি বললেন: যেভাবেই হোক আমি তার সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করব।

এদিকে রাজপ্রাসাদে টম ক্যান্টির অবস্থাও বড়ই করুণ। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বলছে বাহ্! আমাকে সত্যি একজন রাজকুমারের মতো দেখা যাচ্ছে। আহ! আমার বস্তির সবাই যদি আমাকে অন্তত একবার এই পোশাকে দেখতে পেত! কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগল, সে ভীত হয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ করে দরজা খুলে একটা মেয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল– রাজকুমার আপনার কি কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে? কিন্তু রাজকুমাররূপী টম ক্যান্টি তখন বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে, আমি হারিয়ে গেছি–আমি হারিয়ে গেছি। এরা এবার নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করবে। তারপর সে সেই মেয়েটির কাছেই হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল, আমাকে দয়া করো, আমি রাজকুমার নই, আমি টম ক্যান্টি। আমার ছেঁড়া কাপড়চোপড় আমাকে ফিরিয়ে দাও এবং আমায় বাড়ি যেতে দাও। কিন্তু মেয়েটি কোনো কথা না বলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর এখান থেকে সেখানে এমনিভাবে প্রচার হয়ে গেল যে রাজকুমার পাগল হয়ে গেছে। সে অপ্রকৃতিস্থ এবং রাজা নিজে একটা ফরমান জারি করে সবাইকে সাবধান করে দিলেন যে রাজকুমারের অসুখের কথা যেন রাজপ্রাসাদের বাইরে না যায়।

একদিন রাজকুমাররূপী টমকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে রাজাকে দেখে টম বলে উঠল, আপনিই হলেন এখানকার রাজা? এই কথা শুনে রাজা বললেন, আমি যে গুজব শুনেছিলাম তা দেখছি সত্যি। রাজা আদর করে তাকে ডাকলেন। কিন্তু টম বলে উঠল, মহাশয়, আপনি আমার বাবা নন এবং আমিও রাজকুমার নই। আমি আপনার অধীন একজন গরিব প্রজা। কোনো এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে আমি এখানে এসে পড়েছি। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। আমাকে হত্যা করবেন না।

রাজা ভাবলেন, বোধ হয় সে তার নিজের পরিচয় ভুলে গেছে। তাই পরীক্ষা করার জন্য ল্যাটিন ভাষায় প্রশ্ন করলেন। টম ঠিক ঠিক উত্তরই দিল। তখন রাজা মনে মনে ভাবলেন যে বেশি পড়াশোনা করার জন্য তার এই অবস্থা হয়েছে। তাকে খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখতে হবে। সে হলো আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আর কালই তার অভিষেক করতে হবে। রাজা যাকে কথাগুলো বলছিলেন তিনি বলে উঠলেন, হুজুর আপনি কি ভুলে গেছেন নরফোকের ডিউক এখনও আপনার রাজনৈতিক বন্দি, তাকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। রাজা বললেন, সে আদেশ ঠিক থাকবে। ঠিক আছে হুজুর, বলে লোকটা বিদায় নিল।

সেদিন রাজকুমারের ঘরে বসে টম একা একা বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের উপর। সে বলল, উহ্! এটা অসহ্য, রাজার আদেশে ঐ লোকটাকে হত্যা করা হবে। আহা! এই সময় যদি সত্যিকারের রাজকুমার ফিরে আসতেন।

সেদিন বিকেলে লর্ড হার্টফোর্ড রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, তুমি যেই হও, তুমি যে রাজকুমার নও এ–কথা অস্বীকার করবে না। টমও ভাবল, ঠিক আছে তারা যেভাবে বলে সেভাবে চলে দেখি। এরপর থেকে টম রাজকুমারের যাবতীয় কাজ করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে পদে পদে ভুল করতে লাগল। যেমন ভালো তোয়ালে নষ্ট হবে মনে করে হাত মুছতে ভয় পেতে লাগল। গোলাপজল দেওয়া হাত ধোয়ার পানি সে পান করে ফেলল। ফলমূল, বাদাম সব পকেটে পুরে ফেলতে লাগল। সেদিন বিকেলে অসুস্থ রাজার অবস্থার আরও অবনতি হলো।

রাজার সঙ্গে রাজার পরামর্শদাতা লর্ড চ্যান্সেলর দেখা করলেন। রাজা বললেন, আমি শীঘ্রই মারা যাব। ডিউক অব নরফোকের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করতে হবে। তাই একটা মৃত্যুর পরোয়ানা লিখে নিয়ে এসো, আমি তাতে আমার সিল দিয়ে দিই। রাজা বিছানায় উঠে বসতে চাইলেন কিন্তু দুর্বলতার জন্য পারলেন না। এদিকে বড় সিলটা অনেক খোঁজার পরও পাওয়া গেল না। রাজা মনে মনে বললেন, আমি রাজকুমারের কাছে সিলটা রেখেছিলাম। রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে বলল যে, সে সিলটা কোথায় রেখেছে তা মনে করতে পারছে না। আপাতত ছোট সিল দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। রাজকুমারকে আনন্দিত রাখার জন্য তাকে নৌবিহারে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু এতসব আনন্দের মধ্যে থেকেও সে সুখী হতে পারছিল না।

এদিকে সত্যিকারের রাজকুমার রাস্তায় রাস্তায় লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন। রাজকুমারকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একজন জোয়ান এগিয়ে এসে সবাইকে বাধা দিলেন। ফলে সৈনিকের সঙ্গে বিদ্রুপকারীদের তর্ক শুরু হলো। আর ঠিক এই সময় রাজার ঘোড়সওয়ারেরা সেই রাস্তায় তাদের মাঝখানে এসে পড়ল এবং সৈনিক ও রাজকুমার সবার থেকে আলাদা হয়ে পালিয়ে গেলেন।

এর কিছুক্ষণ পর রাস্তায় রাস্তায় এক ফরমান পাঠ করা হলো। এতে সবাইকে বলা হলো যে, রাজা মারা গিয়েছেন এবং রাজকুমার এডওয়ার্ড নতুন রাজা হয়েছেন। টম তার উপদেষ্টা লর্ড হার্টফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি এখন থেকে রাজা হয়ে থাকি তাহলে আমার আদেশ বহাল থাকবে? লর্ড হার্টফোর্ড বললেন, নিশ্চয়ই আপনার হুকুমই আইন। টম ক্যান্টি তখন বলল : আমার রাজত্ব হবে দয়ার, ক্ষমার। কোনো রক্তপাত হবে না আমার রাজত্বে এবং নোরফোকের ডিউকের মৃত্যুদণ্ড আমি তুলে নিয়ে তাকে মুক্ত করলাম।

অন্যদিকে রাজকুমার যখন তার নতুন বন্ধুকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটছিলেন তখন রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমার বাবা মারা গিয়েছেন। নতুন সৈনিকটি বলল, ওহো আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি রাজকুমার এডওয়ার্ড, এ দেশের নতুন রাজা। সৈনিক মনে মনে ভাবছিল : আহা বেচারা, তার মাথাটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সব অবস্থাতে এই ছেলেটিকে আপদে–বিপদে রক্ষা করে যাব।

এরপর সৈনিকটি রাজকুমারকে একটা সরাইখানাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু যেইমাত্র তারা সেখানে ঢুকতে যাবেন তখনই টমের বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এবার তুই পালিয়ে যেতে পারবি না বাছাধন, তোকে আচ্ছা করে পিটুনি দেব। সৈনিক লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি তোমার কী হয়? লোকটি উত্তর দিলেন, এই বজ্জাত ছেলেটি আমার ছেলে। রাজকুমার বলে উঠলেন, মিথ্যা কথা, আমাকে যেন এই লোকটার জিম্মায় ছেড়ে দিও না। সৈনিক বললেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি আমার সাথেই থাকবে। জন ক্যান্টি তখন গজরাতে গজরাতে বললেন, আচ্ছা দেখা যাবে। সৈনিক তখন তার খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বললেন, সাবধান একে ছুঁয়েছ কি তোমার একদিন কি আমার একদিন। এই ছেলে আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। তুমি কি মনে করো তোমার মতো একজন জঘন্য ব্যক্তির হাতে একে ছেড়ে দেব? যাও এখান থেকে সরে পড়ো, আর এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকতেই চেষ্টা করো।

সৈনিক রাজকুমারকে বললেন, আমি থাকতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না বা কেউ জ্বালাতনও করতে পারবে না। রাজকুমার বললেন, সৈনিক, তোমাকে ধন্যবাদ, আমি যখন আমার সিংহাসনে আরোহণ করব তখন তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তারপরে সরাইখানাতে গিয়ে রাজকুমার ঘুমালেন আর সৈনিক তার জন্য একটা পোশাকের ব্যবস্থা করার জন্য চলে গেলেন।

ভোরে সৈনিক নিজ হাতে একটা পোশাক কিনে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন রাজকুমার বিছানায় নেই। তখন তিনি দৌড়ে সরাইখানাওয়ালার কাছে গিয়ে হুমকি দিলেন। তখন সরাইখানাওয়ালা বললেন, ও তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। আপনার সংবাদবাহক এসে খবর দিয়েছে যে আপনি তাকে লন্ডন ব্রিজের ওখানে দেখা করতে বলেছেন।

সংবাদবাহক কি একা ছিল?

হ্যাঁ, কিন্তু সে যখন ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেল,তখন আরও একজন বদমাইশ প্রকৃতির লোক তাকে অনুসরণ করছিল।

একথা শুনে সৈনিক ছুটলেন রাজকুমারের খোঁজে।

এদিকে নকল রাজকুমার টম বিচার ও অন্যান্য রাজকার্য সমাধা করে যাচ্ছে। আর সত্যিকার রাজকুমার লন্ডন ব্রিজের দিকে তার রাজপ্রাসাদের কারও সঙ্গে দেখা হবে এই আশায় সেদিকে চলেছেন। হঠাৎ রাজকুমারের কানে এল, তোমার রক্ষক বন্ধু তোমাকে আজ রক্ষা করার জন্য আসছে না। রাজকুমার বললেন, এটা কোন ধরনের ধূর্ততা! তখন জন ক্যান্টি চাবুক হাতে এগিয়ে এসে বললেন, নিশ্চয়ই তুই তোর বাবাকে চিনতে ভুল করিসনি। এখন এই গুদামঘরের ভেতর ঢোক এবং যতদিন পর্যন্ত আমার জন্য ভিক্ষা করতে রাজি না হবি এখানেই তোকে কাটাতে হবে। এদিকে সেই সৈনিক পইপই করে রাজকুমারকে খুঁজছেন। পরে তিনি অনুমান

করলেন যে সেই বদমাইশ লোকটা যে তাকে ছেলেটির বাবা বলে পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছিল, নিশ্চয়ই সে তাকে কোথাও আটকে রেখেছে। ভীত ও সন্ত্রস্ত রাজকুমার পুরাতন গুদামের মধ্যে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন ।

হঠাৎ রাতে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন তিনি দেখলেন যে কয়েকজন চোরের এক সভা বসেছে। তারা সবাই চুরির জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। রাজকুমারের দিকে চোখ পড়তেই তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে তার মাথায় এক ছেঁড়া টুপি পরিয়ে দলের নেতা বললেন, আমি তোমাকে ফুফু দি ফাস্ট নামে নামকরণ করলাম। পরের দিন ভোরে রাজকুমার ও তার সঙ্গী ছেলেটি ভিক্ষা করতে বের হলেন। রাজকুমারকে ছেলেটি বলল, তুমি আমাকে হাগ্‌স বলে ডাকতে পারো। রাজকুমার বললেন, কিন্তু আমি তোমার মতো ভিক্ষা করতে পারব না। হাগ্‌স বলল, তুমি এত সাধু হলে কবে থেকে? তোমার বাবা যে বলল, তুমি গত জীবনে লন্ডনে ভিক্ষা করে কাটিয়েছ? রাজকুমার বললেন, ওই বদমাইশটা আমার বাবা নয়। এমন সময় হাগ্‌স বলল, শীঘ্র এদিকে এসো। একজন ধনী লোক এদিকে আসছে। তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে না। তুমি শুধু ভান করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর আমি মাটির উপর শুয়ে অজ্ঞান হবার ভান করব। যখন ধনী লোকটি তোমার সামনের দিকে আসবে তখন হইচই করে চিৎকার করে বলবে যে আমি তোমার ভাই এবং আমরা কয়েক দিন কিছুই খাইনি। তারপর ছেলেটি রাজকুমারকে শাসিয়ে বলল, ঠিকমতো যদি কথা না শোনো তাহলে তোমার শরীরের হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করব।

ধনী ভদ্রলোকটি হাগ্‌সের কাছে এসে তাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে? তখন সে বলল, আমি এক গরিব ছেলে, অনাহারে ভুগছি, আমাকে দয়া করে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করুন। লোকটি বললেন, আহা গরিব বেচারা, তোমায় একটা কেন তিনটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করব। ছেলেটি বলল, জনাব দয়া করে যদি আমাকে একটু ধরে ধরে আমার বাড়ি পৌঁছে দেন। এমনি সময় রাজকুমার চিৎকার করে উঠলেন, ও আমার ভাই নয়, সে একজন ভিক্ষুক ও চোর, আপনি লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে, সে আপনার পকেট কেটেছে। আপনার লাঠির এক বাড়িতে ওর সব ভান পালাবে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাগ্‌স দৌড়ে পালাল।

রাজকুমার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি ভাবলেন এখন যদি আমি না পালিয়ে যাই তাহলে হাগ্‌স ভিক্ষুকদের নিয়ে এসে আমায় তাড়া করবে। তিনি সমস্তটা দিন কৃষকদের জমির চারদিক দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। সন্ধ্যার দিকে এক বনের ধারে এসে হাজির হলেন । এখানে দূরে একটা কুটিরে আলো জ্বলতে দেখে সে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। এই কুটিরটা ছিল একজন ঋষিতুল্য সন্ন্যাসীর। রাজকুমার ভিতরে গিয়ে পরিচয় দিলেন যে, সে ইংল্যান্ডের রাজা। কুটিরের ভিতরের সন্ন্যাসী বললেন, এসো ভিতরে এসো। আমার এখানে কাউকে জায়গা দিই না, তবে রাজার জন্য নিশ্চয়ই আমার জায়গা আছে। রাজকুমারকে সম্বোধন করে সন্ন্যাসী বললেন, আমার তোমাকে বিচার করার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি তোমাকে একটি গোপন তথ্য বলব, আমি সন্ন্যাসী নই। আমি হলাম একজন ফেরেস্তা। তুমি তাহলে হেনরির ছেলে, সে কি বেঁচে আছে? রাজকুমার বলল, না কিছুক্ষণ আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

সন্ন্যাসী তাকে খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় ঘুমোতে দিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী এসে তাকে বলতে লাগলেন, তুমি তো জানো না তোমার বাবা আমার উপর অত্যাচার করেছেন। আমাকে ধর্ম থেকে বিতাড়িত করেছেন। আমাকে ও আমার অনুসারীদের দেশ থেকে তাড়িয়েছেন। এই জঙ্গলে আমি পালিয়ে আছি। যখন বুঝতে পারল যে রাজকুমার ঘুমিয়ে তখন তিনি বললেন, যতক্ষণ বেঁচে আছ সুখস্বপ্ন দেখে নাও। এই বলে তিনি বড় পাথরে ছুরি শান দিতে দিতে বলতে লাগলেন, তোমার বাবা আমার হাত থেকে বেঁচে গেছে, তুমি বাঁচবে না। তারপর তিনি তার হাত-পা ও মুখ দড়ি ও কাপড় দিয়ে বাঁধলেন। তারপর সন্ন্যাসী যেইমাত্র ছুরি উঁচিয়ে রাজকুমারকে হত্যা করতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কে যেন কড়া নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, বাসায় কে আছে? রাজকুমার সেই স্বর শুনে ভাবলেন, এ তো সেই সৈনিক বন্ধুর গলা। সন্ন্যাসী দরজা খুলে দিতেই সৈনিক জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কোথায়? সন্ন্যাসী বললেন, কোন ছেলে? তখন সৈনিক রেগে গিয়ে বললেন, যে ছেলেটা চুরি করেছিল তাকে আমি শাস্তি দিয়েছি। এখন তোমার এখানে যে এসেছে সে ছেলেটি কোথায়?

সন্ন্যাসী প্রথমে নানা কথা বলে তাকে ফাঁকি দিতে চাইলেন। কিন্তু সৈনিকের চাপের মুখে সন্ন্যাসী রাজকুমারকে সৈনিকের হাতে তুলে দিলেন। সৈনিক তখন সেই কেনা পোশাক রাজকুমারকে পরিয়ে গ্রাম থেকে দুটি গাধা কিনে এনে তাতে চড়ে শহরের দিকে রওনা হলেন।

শহরে হেনডেন হলে এসে তারা পৌঁছলেন। এই হেনডেন হলটা ছিল সৈনিকের বাড়ি। সৈনিক বাড়ির কড়া নাড়তেই তার ভাই বেরিয়ে এলেন। সৈনিক তখন বললেন, আরে আমার ভাই। উহ্! প্রায় সাত বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। কিন্তু তার ভাই তাকে না চেনার ভান করে বললেন, আপনি কে? সৈনিক বলল, আমি তোমার ভাই মাইল্‌স হেনডেন। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? তখন তার ভাই বললেন,আমার ভাই! তিনি তো কবে প্রায় তিন বছর হলো যুদ্ধে মারা গেছেন। তুমি একজন জালিয়াত। সৈনিক বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ঠিক আছে, তোমার বাবাকে ডাকো। বাবা মারা গেছেন। উহ্! বড় দুঃখের সংবাদ, তাহলে লেডি এডিথকে ডাকো। কিছুক্ষণ পরে সৈনিকের ভাই এক সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো এই লোকটাকে তুমি চেনো কি না? লেডি এডিথ বললেন, এ লোকটাকে জীবনে আমি কখনো দেখিনি। সৈনিক রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, বদমাইশ, মিথ্যুক, তুমি নিজে চিঠি লিখে জানিয়েছ যে আমি মরে গেছি এবং তারপর আমার বাগদত্তাকে বিয়ে করেছ। আমার সামনে থেকে দূর হও, নচেৎ তোমায় আমি হত্যা করব। এই বলে সৈনিক তার ভাইকে আক্রমণ করলেন।

আক্রান্ত ভাইয়ের চিৎকারে সব চাকর এসে হাজির। তখন সৈনিকের ভাই হিউগ বললেন, সব দরজা বন্ধ করে দাও যেন এই জালিয়াত পালাতে না পারে। সৈনিক বললেন, আমি পালাচ্ছি না, যে পর্যন্ত আমি ন্যায়মতো হেনডন হলের উত্তরাধিকারী হচ্ছি। রাজকুমার বললেন, সত্যি বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। সৈনিক বললেন, হিউগ ছোটবেলা থেকেই বদমাইশ আর জোচ্চোর স্বভাবের ছিল। রাজকুমার বললেন, আমি ভাবছি যে আমাকে খোঁজার জন্য এখনও কোনো সৈন্য পাঠানো হলো না কেন? সৈনিক মনে মনে বললেন, আহা! বেচারার রাজকীয় দুঃস্বপ্ন এখনো যায়নি। রাজকুমার বললেন, আমি আমার সমস্ত ঘটনা এ কারণে লিখে রেখেছি। এটা তুমি আগামীকাল আমার চাচা লর্ড হাটফোর্ডের কাছে পৌঁছে দেবে। সৈনিক বললেন, ঠিক আছে।

ঠিক এমনই সময় একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল : দয়া করে একটু থামুন স্যার। সৈনিক বলনেল, বাগদত্তা বধূ এডিথ, তুমি এখনো আমাকে না-চেনার ভান করছ? এডিথ বললেন, আমি দুঃখিত স্যার, না, আমি না–চেনার ভান করছি না। আমি আপনার জন্য সমবেদনা অনুভব করছি। কারণ আপনি মাইল্‌সের মতো দেখতে। আপনি আমার স্বামীকে বিরক্ত করলে সে আপনাকে হত্যা করবে। সৈনিক বললেন, না একথা সত্যি নয়। তুমি সমবেদনা জানাতে আসনি, তুমি আমায় ভালোবাস তাই এসেছ।

ঠিক এমনি সময় পুলিশ এসে দরজা খুলে সৈনিক ও রাজকুমারকে জেলখানায় নিয়ে গেল। জেলখানায় তাদের কয়েক দিন কাটল। তারপর একদিন একজন পুরোনো চাকর এসে সৈনিকের সঙ্গো লুকিয়ে দেখা করল। সে বলল, হুজুর আমি মনে করেছি আপনি মারা গেছেন। আপনাকে আবার জীবিত দেখলাম, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। সৈনিক বললেন, এন্ড্রু, আমি জানতাম তুমি আমার বিরুদ্ধে যাবে না।

প্রতিদিনই এন্ড্রু সৈনিকের সঙ্গো দেখা করে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে যেতে লাগল। এন্ড্রু বলল, এডিথ হিউগকে বিয়ে করেছে কিন্তু সে মোটেও সুখী নয়। সে এখনও আপনাকে ভালোবাসে। আপনার ভাই হিউগ আমাদের শাসিয়েছে। আমরা কেউ যদি আপনাকে চিনি বলে পরিচয় দিই তাহলে সে আমাদের হত্যা করবে। এখন রাজার অভিষেক হবার পরে নতুন রাজার অনুগ্রহে সে অনেক কিছু করবে বলে আশা করছে।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন অভিষেক উৎসব কবে? সৈনিক মাইল্‌সকে বললেন, তারা আর কাউকে সিংহাসনে বসাচ্ছে। আমাদের ওয়েস্টমিনস্টার গির্জায় যেতে হবে এবং যে করেই হোক এই অভিষেক উৎসব বন্ধ করতে হবে। সৈনিক বললেন, কালই আমার বিচার হবে, ঠিক সময়মতোই সেখানে পৌঁছাতে পারব।

পরের দিন বিচারে মাইল্‌সের দুদিনের জেল হবার আদেশ শোনার সঙ্গো সঙ্গো রাজকুমার বললেন, হে জজ, আপনি কেমন করে এর প্রতি অবিচার করতে পারেন? আমি আপনাকে হুকুম দিচ্ছি একে মুক্তি দিন। বিচারক সঙ্গো সঙ্গো বললেন যে, এই বোকা ছেলেটাকে কয়েক ঘা বেত লাগাও। তাহলে তার জিহ্বা সংযত হবে। সৈনিক নিজে বিচারকের কাছে মিনতি করলেন যে বালকটি বড় দুর্বল। বালকের ভাগের চাবুক আমাকে মারার অনুমতি দিন।

উত্তম প্রস্তাব, এই বেকুবকে এক ডজন চাবুক কষে লাগাও। চাবুক খাওয়া শেষে জেলখানার ভিতরে রাজকুমার সৈনিককে বললেন, তুমি সব লোক থেকে মহান এবং তোমাকে আজ থেকে আরল খেতাবে ভূষিত করলাম।

দুদিন পরে তারা দুজনেই কারামুক্ত হয়ে লন্ডনের পথে রাজার অভিষেক দেখার জন্য রওনা হলেন। সৈনিক ভাবছিলেন এ যাত্রায় দুটো কাজ হবে। এক : রাজকুমারের ইচ্ছা পূরণ হবে, আর দুই : আমার বাবার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গো রাজপ্রাসাদে আমার দেখা হয়ে যাবে। তারা লন্ডনে ঢোকার পরে দেখলেন সবাই উৎসবে মেতে আছে। হঠাৎ একজন বলে উঠল, তুমি ধাক্কা দিয়ে আমার হাতের পেয়ালা ফেলে দিলে কেন? অন্যজন উত্তর দিল, সে ইচ্ছা করে ধাক্কা দেয়নি। এখন তুমি কী করতে চাও?

এমনিভাবে কথা কাটাকাটি করতে করতে শেষে হাতাহাতি শুরু হলো এবং সব লোক এই গন্ডগোল দেখে এদিকে–সেদিকে ছুটে পালাতে লাগল। এর মধ্যে সৈনিক ও রাজকুমার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যাক, গন্ডগোল শেষে খুঁজে পাওয়া যাবে এই মনে করে রাজকুমার একাই নিজে অভিষেক দেখার জন্য রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। পথ চলতে চলতে রাজ্যের সব অনাচার তার চোখের উপর ভেসে উঠল। আর তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পরে এইসব অন্যায় ও অনাচার দূর করতে চেষ্টা করবেন।

এদিকে রাজপ্রাসাদে টম ক্যান্টির জন্য আজ দিনটা বড় আনন্দের। তাকে ভালো ভালো কাপড় পরানো হলো। বিভিন্ন খাবারও এল। সে মনে মনে ভাবল রাজা হওয়ায় ভারি মজা এবং অভিষেকে যাবার পথে সে আরও আনন্দিত হলো। তার হাতে কয়েক থলি মুদ্রা গরিবের মধ্যে ছুড়ে ছুড়ে তা বিতরণ করার জন্য দেওয়া হলো। সে গাড়িতে বসে ছুড়ে ছুড়ে তা বিতরণ করছিল। এমনি সময় ভিড়ের মধ্যে সে তার মাকে দেখতে পেল এবং তার অজান্তেই তার হাত মাথায় চলে গেল। এদিকে তার মাও তাকে চিনতে পারল, 'টম আমার টম' বলে গাড়ির দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু গাড়ির প্রহরীরা তাকে আটকে ফেলল। তখন টম তার মন্ত্রণাদাতাকে বলল, এই প্রৌঢ় মহিলাটি আমার মা। এই কথা শুনে হাটফোর্ড তাড়াতাড়ি আর্চ–বিশপের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন যে, রাজকুমারের পাগলামিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কাজেই অভিষেকের কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করলেই ভালো হয়।

এই কথা অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। তারা সবাই যখন দরবারকক্ষে এসে পৌঁছালেন ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক বালককণ্ঠে উচ্চারিত হলো : থামো, আমিই হলাম আসল রাজকুমার। দরবারের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে উঠলেন, এই ভিক্ষুক ছেলেটাকে বের করে দাও। কিন্তু সিংহাসন থেকে টম বলে উঠল, না না, সেই সত্যিকারের রাজকুমার। টম ক্যান্টি তখন সব ঘটনা হাটফোর্ডকে খুলে বলল। তখন হাটফোর্ড বললেন, এ যে অবিশ্বাস্য ঘটনা। তবে এই ব্যাপারে একটা মাত্র পরীক্ষা হবে–যার দ্বারা এই ঘটনার ফয়সালা হবে যে কে সত্যিকারের রাজকুমার। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো বড় রাজকীয় সিলটা কোথায় আছে? ভিখারিরূপী রাজকুমার বলল, এ তো অতি সাধারণ প্রশ্ন। আমার কামরায় গিয়ে টেবিলের বামদিকে একটা লোহার পেরেক আছে, সেটা চাপ দিলে একটা গুপ্ত আলমারির দরজা খুলে যাবে, সেখানেই সিলটা পাবেন।

হাটফোর্ড ত্বরিত সিল আনার জন্য চলে গেলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পর খালি হাতে ফিরে এসে বললেন, সিলটা পাওয়া গেল না। তখন হাটফোর্ড বললেন, এতে শুধু একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়। ভিখারিরূপী রাজকুমার হাটফোর্ডকে প্রশ্ন করল, আপনি ঠিকমতো খুঁজে দেখেছেন তো? হাটফোর্ড বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু কোথাও সেই বড় সোনালি গোল সিলটা পাওয়া গেল না। টম বলল, একটা বড় সোনালি গোল সিলের কথা বলছেন, আরে তোমার টেবিলের উপরই ছিল এবং পরে তুমি সেটাকে লুকালে। ভিখারি রাজকুমার বললেন, আর বলতে হবে না মনে পড়ছে। হাটফোর্ড, আমার ঘরে যে লোহার বর্ম আছে তার বাহুর তলে বড় সোনালি সিলটা আছে। আবার হাটফোর্ড দৌড়ে সিলটা খুঁজতে গেল এবং তাড়াতাড়িই ফেরত এসে বলল, আপনাকে সন্দেহ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন হুজুর।

এর মধ্যে সৈনিক মাইল্‌স হেনডেন একদিন পরে এসে প্রাসাদে পৌঁছালেন। দ্বারী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কী করছ? সৈনিক বললেন, আমি আমার স্বর্গীয় পিতার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দ্বারী বললেন, লোকটাকে সন্দেহ হচ্ছে, তোমরা একে তল্লাশি করো। তারা তার দেহ তল্লাশি চালিয়ে একটা পত্র পেল। তাতে লেখা : 'লর্ড হার্টফোর্ড সমীপেষু, এই পত্রবাহক আমার বন্ধু স্যার মাইল্‌স হেনডেন।'

সৈনিক মাইল্‌সকে রাজকুমারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সৈনিক তখন ভাবছেন : আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না সত্যি? তখন রাজকুমার বলল, হাঁ মাইল্‌স, তুমি আমার পাশে বসো, এই অধিকার তোমাকে আগে দেওয়া হয়েছে। তারপর হিউগ হেনডেনকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করা হলো।

হিউগের মৃত্যুর পরে মাইল্‌সের সঙ্গে এডিথের বিয়ে হলো। তিনি তার মা ও বোনদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে বসবাস করতে লাগলেন। রাজকুমারকে যারা সাহায্য করেছিল, সবাইকে পুরস্কৃত করা হলো। আর যারা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো।

রাজা এডওয়ার্ডের রাজত্ব খুব ন্যায় ও শান্তির রাজত্ব ছিল। একদিন রাজকুমার টমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার বড় গোল সিলটার কথা কীভাবে মনে রাখলে? টম বলল, মনে থাকবে না? ওটা দিয়ে তো আমি প্রতিদিন বাদামের খোসা ছাড়াতাম ও বাদাম ভাঙতাম। এটাকে আমি হাতুড়ির মতোই ব্যবহার করেছি।

সার–সংক্ষেপ

প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে লন্ডনে এক রাজকুমার ভিখারির ছেলে এবং ভিখারির ছেলে রাজকুমার হয়ে গিয়েছিল। ভিখারির ছেলের জন্ম হয়েছিল লন্ডনের এক বস্তিতে এবং রাজকুমারের জন্ম হয়েছিল রাজপ্রাসাদে।

ভিখারির ছেলের নাম টম ক্যান্টি। সে বস্তিতে বড় হতে লাগল এবং বিভিন্ন লোকের কাছে ভিক্ষা শিক্ষার পাঠ নিতে লাগল। রাজকুমার রাজপ্রাসাদে বড় হতে লাগলেন এবং বড় বড় পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিদ্যাশিক্ষা নিতে লাগলেন। টম ছিল খুব কল্পনাবিলাসী। সে নিজেকে সত্যিকার রাজকুমার বলে কল্পনা করত এবং সমবয়সীদের নিকট রাজকুমারকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করত। সেজন্য একদিন হাঁটতে হাঁটতে রাজপ্রাসাদের কাছে এসে গেট দিয়ে এক সুন্দর পোশাক পরা বালককে দেখল। সে ভাবল এ নিশ্চয় রাজকুমার। এমন সময় দারোয়ান এসে তাকে পদাঘাত করল। রাজকুমার তা দেখে দারোয়ানকে খুব বকা দিয়ে টমকে রাজপ্রাসাদের ভেতর নিয়ে গেলেন। দুজনে অনেক গল্প করলেন। টম তার জীবনের গল্প এবং রাজকুমার তার জীবনের গল্প একে অপরকে বললেন। টমের কাছে সব স্বপ্নের মতো মনে হলো। একজনের কাছে অন্যজনের জীবন ভালো লাগায় তারা পোশাক বদল করলেন। রাজকুমার হলেন ভিখারির ছেলে আর ভিখারি হলো রাজার ছেলে। টম চলে গেল রাজপ্রাসাদে আর রাজকুমার বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। দুজনের নতুন জীবনে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে, তারা যাতে বুঝতে পারেন তাদের নিজ নিজ জীবনই তাদের জন্য আনন্দদায়ক। পরে বিভিন্ন চড়াই–উৎরাই পার হয়ে দুজনেই নিজেদের আগের জীবনে ফিরে এলেন।

শব্দার্থ

রাজকুমার – রাজপুত্র, রাজার ছেলে।

রাজপ্রাসাদ – রাজার বাসস্থান।

বস্তি – দরিদ্রপল্লি।

ভিখারি – ভিক্ষুক, অনুগ্রহপ্রার্থী।

পণ্ডিত – বিদ্বান, জ্ঞানী।

স্বপ্ন – নিদ্রাকালে দৃষ্ট ব্যাপার।

ল্যাটিন – প্রাচীন রোমান জাতির ভাষা, রোমান ভাষা।

পোশাক – পরিচ্ছদ, জামাকাপড়।

দারোয়ান – পাহারাদার।

গুজব – জনরব, মুখে মুখে রচিত কথা।

পরামর্শ – মন্ত্রণা, যুক্তি ।

উপদেষ্টা – শিক্ষাদাতা, উপদেশদাতা।

সৈনিক – সৈন্য, প্রহরী, যোদ্ধা ।

সরাইখানা - পান্থশালা, পথিক নিবাস।

সন্ন্যাসী – যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন।

বাগদত্তা – যে কন্যাকে নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

অভিষেক – রাজসিংহাসনে আরোহণের জন্য অনুষ্ঠান।

হোস্টেল – ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস।

পানীয় – পান করার যোগ্য।

গুদামঘর – মালামাল রাখার ঘর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. টম কী রকম ছেলে?

ক. ভ্রমণবিলাসী
খ. কল্পনাবিলাসী
গ. দায়িত্বজ্ঞানহীন
ঘ. বিদ্যানুরাগী

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রবির বাবা হতদরিদ্র মানুষ। পুত্রের প্রতি তার দয়া নেই। রবিকে দিয়ে কত বেশি কাজ করানো যায়, পয়সা রোজগার করা যায়– এই তার লক্ষ্য। তাই সামান্য অবাধ্য হলেই সে রবিকে শাস্তি দেয়।

২. কোন চরিত্রটির সাথে রবির পিতার কোনো মিল নেই।

ক. দারোয়ানের
খ. জন ক্যান্টির
গ. ফাদার এন্ড্রুর
ঘ. সৈনিকের

৩. রবির বাবার সঙ্গে ক্যান্টির বাবার যে মিল লক্ষ করা যায় তাহলো–

ক. উভয়েই শিক্ষিত
খ. উভয়েই বেকার
গ. উভয়েই নিষ্ঠুর
ঘ. উভয়েই বেহিসেবি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কলিমুল্লাহর ডাকনাম কালু। এদের পরিবারটি দরিদ্র। পাঁচজন ভাইবোনের মধ্যে ৬ষ্ঠ জন হিসেবে কালুর জন্ম হলে পিতা রহমান হতাশ হয়। আরও একটি মুখের খাবার কী করে জোটাবে সেই চিন্তায় রহমানের চোখে ঘুম নেই। অন্য দিকে কাশেম চৌধুরীর ছোট ও সচ্ছল পরিবারে রিফাতের জন্ম হয়। এতে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়–স্বজনদের মধ্যে আনন্দের সীমা থাকে না।

ক. 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে কালুর মিল আছে।

খ. রিফাতের সঙ্গে রাজকুমারের সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে মার্ক টোয়েনের 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে' গল্পটির মিল ও অমিল চিহ্নিত কর।

ঘ. 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে' গল্পের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের অংশটুকুর যৌক্তিকতা নিরূপণ কর।

২. একজন ভিক্ষুককে রাজপ্রাসাদে বসবাসের স্থান করে দেয়া হলে সে অনেক সমস্যায় পড়বে। তার জীবন সহজ, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ থাকবে না। ঠিক একইভাবে একজন রাজকুমারকে যদি ভিক্ষুকের জীবনে ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে সেই জীবন সুখের হবে না। প্রতি মুহূর্তে তাকে নানা দুর্বিপাকে পড়তে হবে। এ জন্যই হয়তো বলা হয়, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।

ক. 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে' গল্পের রাজকুমারের নাম কী?

খ. রাজকুমারের সংকটাপন্ন জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকটি 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে' গল্পের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত—আলোচনা কর।

ঘ. 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে' শীর্ষক গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর যে, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।

রবিনসন ক্রুশো
ড্যানিয়েল ডিফো

রবিনসন ক্রুশো ইয়র্ক শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ওর বাবা ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং ওর বাবার ইচ্ছে ছিল আইন পাস করে সে ওকালতি করুক। কিন্তু রবিনের কেমন যেন একটা ঝোঁক ছিল মাথায় এবং তা ছেলেবেলা থেকেই– তা হলো, দেশ–বিদেশ ঘুরে বেড়ানো। বিশেষ করে তা যদি সমুদ্রযাত্রা হয় তবে তো কথাই নেই। বড় হয়ে তাই সে তার মা–বাবার কথা না শুনে বাড়ি থেকে না বলে বেশকিছু পাউন্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লন্ডনের উদ্দেশে।

কিন্তু যাত্রার প্রথম থেকেই ওর দুর্ভাগ্য দেখা দিল। ইয়র্ক থেকে লন্ডনে আসার জন্য জাহাজে উঠল কিন্তু জাহাজটি ইয়ারমাউথ নামক স্থানে ডুবে গেল। ভাগ্য ভালো, অন্য একটি জাহাজ যাচ্ছিল ওদের সামনে দিয়ে। ওরা ওদের লাইফবোটে সকলকে তুলে নিল। ক্রুশোর কাছে যা অর্থ ছিল তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত লন্ডন শহরে এসে সে পৌঁছল।

লন্ডনে আসার কদিন পরে জাহাজ–মালিকের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। ভদ্রলোক জাহাজের ব্যবসা করেন এবং এ কারণে প্রায়ই গিনি উপকূলে যাতায়াত করেন। একদিন তিনিই রবিনসনকে বললেন, 'তুমি যদি কিছু মনিহারি মালামাল নিয়ে আমার জাহাজে করে গিনি উপকূলে যাও তাহলে মোটা অঙ্কের টাকা লাভ করতে পারবে।' রবিনসন এই ধরনের কিছু একটা করতে চেয়েছিল। তাই সে লন্ডনে বসবাসরত তার কিছু আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছু পাউন্ড ধার করল এবং সে ঐ পাউন্ড দিয়ে কিছু প্লাস্টিকের খেলনা, কিছু পুঁতির মালা এবং আরও এমন কিছু কিনে নিল যা ঐ অঞ্চলের লোকজন পছন্দ করবে। এবার ঈশ্বরের নাম নিয়ে গিনির পথে সমুদ্রযাত্রা শুরু হলো।

প্রথম যাত্রাতে ওর মোটামুটি লাভই হলো। অঙ্কের হিসাবে ৫ পাউন্ডের জিনিস সে বিক্রি করেছে ২০ পাউন্ডে। এবার ওর আনন্দ দেখে কে! লাভ হলো দুরকম—টাকা তো লাভ হলোই, তার নিজের চেষ্টায় জাহাজ চালানোও কিছু শিখে ফেলল। অবশ্য অল্পতে বেশি লাভের আশায় গিনিতে পরবর্তী যাত্রায় কী ঘটেছিল এবার তার বর্ণনা। গিনি থেকে বাণিজ্য করে ফিরে আসার পথে কয়েকজন মুর জলদস্যু ওর জাহাজ আক্রমণ করল, এবং ওকেসহ সবাইকে ধরে নিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দিল।

অবশ্য রবিনসনকে যার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল সেই মনিব ছিল খুব ভালো। মনিব ভদ্রলোকের ছিল মাছধরার নেশা। মাছ কী করে ধরতে হয় রবিন তা ভালো করে জানত এবং সেই একটিমাত্র কারণে রবিন মনিবের আরও বেশি প্রিয় হয়ে উঠল।

যা হোক, রবিনসন তার মাথা থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা বাদ দেয়নি। অবশ্য পালিয়ে যাবার পথটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না। প্রায় বছর দুই পরে একদিন ওর সুযোগ হলো পালানোর। রবিন ওরই এক সমবয়সী মুর ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছিল মাছ ধরবে বলে। কৌশল করে নৌকাটা একটু গভীর সমুদ্রে নিয়ে মুর ছেলেটিকে

ধাক্কা মেরে ফেলে দিল সমুদ্রে, আর ভয় দেখাল ফিরে না গেলে গুলি করে মারবে। আশ্চর্য ঘটনা হলো, মুর ছেলেটি ওকে ভয় না পেয়ে বরঞ্চ সাহায্য করতে রাজি হলো। ছেলেটিকে রবিনসন আবার নৌকায় তুলে নিল।

আবার যাত্রা শুরু হলো। দুদিন বেশ কষ্ট করে চলার পর তারা একটা পর্তুগিজ জাহাজের দেখা পেল। জাহাজ ওদের কাছে আসতেই ওরা জাহাজিদের সব জানাল। জাহাজিরা ওদের তুলে নিল জাহাজে এবং রবিনসনকে এনে নামিয়ে দিল ব্রাজিলের বন্দরে এবং জাহাজি নিজের জন্য মুর ছেলেটিকে রেখে দিল।

কিছুদিন ব্রাজিলে ওর বেশ সুখেই কাটল। অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ করে নিজের অবস্থা ফিরিয়ে এনেছিল রবিন। কিন্তু ছোটবেলা থেকে অস্থিরচিত্ত রবিনের মাথায় আবার দুর্বুদ্ধি চাপল। ওখানকার স্থানীয়রা ওকে পরামর্শ দিল আবার গিনির সেই পুরোনো বাণিজ্যটা শুরু করতে। ওর তো সমুদ্রযাত্রার পুরোনো নেশা আছেই। তাই একদিন আবার তোড়জোড় করে বেরিয়ে পড়ল গিনির উদ্দেশে।

সমুদ্রযাত্রার প্রথম কয়েকটা দিন বেশ ভালোই যাচ্ছিল, হঠাৎ একদিন উঠল ভীষণ সামুদ্রিক ঝড়। সেই ঝড়ের মধ্যে ওদের জাহাজ গিয়ে আটকে গেল এক অজানা চড়ায়। আর চড়ার বালিতে জাহাজের তলা গেল ভীষণভাবে ফেঁসে। তবু অনেক ভেবে ওরা জাহাজে রক্ষিত ছোট নৌকায় করে ডাঙার দিকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম, প্রচণ্ড এক সমুদ্রের ঢেউ এসে ওদের নৌকাটা উল্টে দিল এবং ওরা সবাই ডুবে গেল। রবিনসনের ভাগ্য ভালো বলতে হবে, সে ভেসে উঠল এবং সাঁতার কেটে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় কূলে পৌঁছল। সেই রাতটা সে বন্য জীবজন্তুর ভয়ে একটা গাছের উপর বসে কাটিয়ে দিল।

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই দেখল আকাশ পরিষ্কার, ঝড় উঠেছিল বলে মনেই হয় না। আরও আশ্চর্য, ঝড়ের বেগ ওদের বড় জাহাজটাকে প্রায় ডাঙাতেই নিয়ে এসেছে। রবিনসন ভাবল, আমরা যদি জাহাজেই থাকতাম তাহলে কাউকেই মরতে হতো না।

এখন আর ভেবে কী হবে? রবিনসনের খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। সে আবার জাহাজে গিয়ে উঠল এবং খুঁজে দেখল খাবারগুলো ঠিক আছে কি না। খাবার ঠিকই ছিল। সে বেশ পেট পুরে খেয়ে নিল। তারপর জাহাজ থেকে কয়েকটা তক্তাকাঠ আর ছুতোরের যন্ত্রপাতি তীরে এনে কোনো রকমে রাত কাটানোর মতো একটা মাচা তৈরি করে নিল। তারপর বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দ্বীপটা ভালো করে দেখার জন্য। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠেই রবিনের মনটা দমে গেল। ঈশ্বরই জানেন কতদিন থাকতে হবে এই দ্বীপে।

রাতে অবশ্য কোনো রকম ঝামেলা হলো না। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে রবিন স্থির করল, প্রয়োজনীয় যা কিছু জাহাজে এখনো ভালো আছে তা সবই নামিয়ে আনতে হবে।

সেদিন থেকে সময় পেলেই ভাটার সময় পানি কমতেই সে জাহাজে চলে যেত এবং নামিয়ে আনত প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্তর। বেশিদিন সময় পেলে রবিনসন হয়তো পুরো জাহাজটাই ডাঙায় তুলে নিয়ে আসত। পারল না, কারণ চৌদ্দ দিনের মাথায় এমন ঝড় উঠল তাতে ঐ ভাঙা জাহাজটা ঝড়ে কোথায় উড়ে গেল তার কোনো চিহ্নও পাওয়া গেল না।

অবশ্য জাহাজ থেকে রবিন কম জিনিস নামিয়ে আনেনি। এখন এসব জিনিস রাখবে কোথায় সেটাও এক ভাবনা। অনেক খুঁজে একটা পাহাড়ে উঠার মধ্যপথে খানিকটা সমতল জায়গা আবিষ্কার করল। ওর উল্টো দিকে উঠে গেছে একটা খাড়া পাহাড়, সেদিক থেকে কোনো বন্য জানোয়ারের আক্রমণের আশঙ্কা খুবই কম। আর বাদবাকি তিনদিকে সে নারকেল পাতা দিয়ে বেশ শক্ত এবং উঁচু করে বেড়া দিয়ে দিল। প্রয়োজন হলে মই লাগিয়ে সে যাতায়াত করত, আর ভেতরে ঢুকেই মইটা তুলে নামিয়ে রাখত মাটিতে।

সব জিনিসপত্র রাখল সেখানেই। তৈরি করল বড় করে একটা থাকার মতো ছাউনি। তাছাড়া পাহাড়ের একটা অংশে প্রকাণ্ড এক গর্ত ছিল, সেটাও যোগ করে নিল ঘর হিসেবে।

থাকার মতো বাসা তৈরি হয়ে গেল ওর। ভাবল তৈরি করতে হবে কিছু আসবাবপত্র। যদিও এসব তৈরির অভ্যেস ওর নেই। যন্ত্র ব্যবহার করতে ওর খুব কষ্ট হলো। প্রথমে বন থেকে কাঠ নিয়ে তৈরি করল একটা চেয়ার। তারপর টেবিল, শেলফ, আরও কত কী! একধরনের শক্ত জংলাগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি করল একটা কোদাল আর জাহাজের ভাঙা একটা লোহার টুকরো পুড়িয়ে পিটিয়ে তৈরি করল জ্বালানি কাঠ কাটা কুড়াল।

এর মধ্যে ঘটল এক মজার ঘটনা। রবিনসন জাহাজ থেকে নামানো জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতেই পেল একটা ছোট থলে, খুলে দেখল তাতে রয়েছে কতকটা তুষ। থলেটা ওর দরকার ছিল ভিন্ন কারণে, তাই ঘরের বাইরে এসে তুষগুলো মাটিতে ফেলে দিল।

এর কিছুদিন পরেই নামল বর্ষা এবং বৃষ্টি। বৃষ্টি হবার কয়েক দিন পরেই রবিনসন আশ্চর্য হয়ে দেখল, যে তুষগুলো সে ফেলেছিল সেখানে অজানা গাছের বেশকিছু অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। রবিনসনের খুব আনন্দ হলো। সে কোদাল দিয়ে সামনের আরও কিছু জমি কুপিয়ে তৈরি করে রাখল। একদিন দেখল অঙ্কুরগুলো

আসলে ধানগাছের, সাথে যবও আছে। একদিন ধান আর যব গাছগুলো একটু বড় হলে সে তা চষাজমিতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বুনে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ জমি থেকে বেশকিছু ধান ও যব পেল।

এবার রবিনসনের ভাবনা– এগুলো মাড়াই করবে কীভাবে? তাছাড়া চাই জাঁতাকল আর রুটি সেঁকবার জন্য তাওয়া। যাই হোক, বুদ্ধিমান রবিন শক্ত কাঠ দিয়ে জাঁতা তৈরি করল, আর নরম মাটি থালার মতো পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করল তাওয়া।

এবার বড় সমস্যা হলো পোশাকের। জাহাজে যা ছিল তাতে আর কতদিন চলে? সেই বনে তো আর যাই হোক, পোশাক বা তৈরি কাপড় পাওয়া যাবে না। তখন আবার নতুন বুদ্ধি আঁটল রবিন– ঘরে রাখা ছিল বেশকিছু শুকনো ছাগলের চামড়া– সে ঐ চামড়া দিয়েই লজ্জা ঢাকার মতো পোশাক তৈরি করে নিল। গালভর্তি দাড়ি–গোঁফ আর তার উপর ছাগলের চামড়ার পোশাক– যা একখানা চেহারা হয়েছে রবিনসনের! ওভাবে দেখলে ওর স্বজাতি হয়তো অজ্ঞান হতো কিংবা ধরেই নিত রবিনসন পাগল হয়ে গেছে।

রবিনসনের আরও একটা মজার কথা হলো পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীন এক দ্বীপে বাস করলেও সে দিন–মাস বছরের হিসাব ঠিক ঠিক রেখেছিল। যেদিন রবিনসনের নৌকোডুবি হয় সেদিনের তারিখ ওর জানা ছিল। তারপর থেকেই রবিন প্রতিদিন পাহাড়ের গায়ে পরপর তারিখ লিখে ক্যালেন্ডার তৈরি করে রেখেছিল। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে একটা করে তারিখ কেটে দিত সে। ঠিক বর্তমানের ডেটকার্ড বদলানোর মতো।

এভাবেই রবিনসনের দিনের পর দিন কাটতে লাগল। রবিনসন ঐ দ্বীপের মুকুটহীন রাজা। যতদূর দৃষ্টি যায় সবটাই ওর রাজত্ব। রবিনসন যখন খেতে বসত তখন ওর সব কুকুর-বেড়াল বসত চারপাশে, তা দেখে মনে হতো রবিনসন রাজা আর ওরা সব যেন প্রজা, প্রজারা যেন সব ওর করুণাপ্রত্যাশী। কিন্তু এভাবে বেশিদিন কাটল না, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল নতুন এক অশান্তি।

রবিনসন একদিন বেলাভূমিতে হাঁটছিল বালি কেটে কেটে নানান ভাবনা মাথায় নিয়ে। এর মধ্যেই হঠাৎ তার চোখ স্থির হয়ে যায় বালির উপর প্রকাণ্ড এক পায়ের ছাপ দেখে। কিন্তু কোথাও জনমানব নেই, এই ছাপ এল কীভাবে, চিন্তা ওখানেই। কোনোকিছুর সন্ধান পেল না বলেই ওর ভীষণ ভয় হলো। শেষে এমন হলো, দিনে ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করলেও রাতে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই স্বপ্নে দেখল, কিছু লোক ওকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। অবশ্য ওর ঘর খুব মজবুত করে তৈরি। তবু রবিন আবার দ্বিগুণ দেয়াল তৈরি করল, যাতে করে ওর ঘর শত্রুর কাছে দুর্ভেদ্য হয়। অবশ্য তাতেও রবিনসনের পুরো ভয় কাটল না।

যাই যাই করে এভাবে কেটে গেল প্রায় দুটি বছর। রবিনসন এখন সেসব ভয়ের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে। এমনি এক সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে যেতেই দেখতে পেল পাঁচখানা নৌকা সাগরের তীরে বাঁধা। আরও স্পষ্ট করে দেখার জন্য রবিনসন পাহাড়ের উপর উঠল। সেখানে থেকে যা দেখল, তাতে ওর হাত–পা ভয়ে ঠাণ্ডা হয় আর কি!

রবিনসন দেখল প্রায় জনা ত্রিশেক লোক বিরাট এক আগুনের কুণ্ডলীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচছে এবং বিদঘুটে আর বীভৎস রকমের চিৎকার করছে। একটু পরেই ওরা দুজন লোককে ওদের সেই নৌকা থেকে

টানতে টানতে তীরের বালিতে নামিয়ে নিয়ে এল। একজনকে তো সাথে সাথেই মেরে ফেলল। আর অন্যজন ওদের একটু অসাবধানতার সুযোগ পেয়ে দৌড় দিল। তিনজন লোক ছুটল ওর পিছু পিছু ওকে ধরতে। কিন্তু লোকটি ছুটছে প্রাণের দায়ে, তার সাথে ওরা পারবে কেন? ঐ লোকটি সোজা ছুটে আসছিল, রবিনসন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে সব দেখছে। প্রথমে ওর ভীষণ ভয় হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল ওদের মধ্যে একজন ফিরে যাচ্ছে,তখন রবিনসন বাকি দুজনের হাত থেকে ওকে বাঁচাবে স্থির করল। ওর হাতে ছিল বন্দুক, মধ্যে একটা লোক, রবিনসনের নাগালের মধ্যে আসতেই কষে দিল এক ঘা। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। এদিকে অন্য লোকটি রবিনসনকে নিশানা করে তীর ছুড়ছে দেখেই বাধ্য হয়ে সে গুলি করল। দ্বিতীয় লোকটি মারা গেল।

যারা তিনজন এসেছিল ওদের তো ব্যবস্থা ভালোই হলো। কিন্তু রবিনসনের বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে এবার যাকে সে বাঁচাল সে-ই উঠে ভয়ে দিল ভোঁ দৌড়। অতিকষ্টে রবিন ওকে দৌড়ে ধরে আনল এবং তার ভয় ভাঙিয়ে দিল। তখন লোকটি বারবার ওর পায়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানাল।

রবিনসন ওকে এবার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কিছু খেতেও দিল, তারপর বিছানা দেখিয়ে বলল ঘুমোতে। লোকটি ভয়ে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল, এবার ঘুমিয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠেই আবার সে রবিনসনের পা নিজের মাথায় রেখে ওদের প্রথামতো বশ্যতা মেনে নিল।

এই পুরো ঘটনাটাই ঘটেছিল ইংরেজি ফ্রাইডে, মানে শুক্রবারে। তাই রবিনসন ওর নাম রাখল ফ্রাইডে। এতদিন বেচারা রবিনসন ছিল একা দ্বীপবাসী। এবার তার দোসর হলো। ফ্রাইডে কথা বলতে জানত না, তাকে খুব যত্ন করে রবিন কথা বলা শেখাল। এমনিতে ফ্রাইডের মাথা খুব পরিষ্কার, যাকে বলে শার্প। সে অল্পদিনের মধ্যেই সব কাজকর্ম শিখে নিল। এছাড়া ওর মনিবের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা দেখে রবিনসন খুবই মুগ্ধ হয়। তাইতো পরবর্তী জীবনে রবিনসন ক্রুশো বারবার বলত– 'অমন বিশ্বাসী ভৃত্য বোধ হয় কেউ কোনোদিন পায়নি, যেমনটি ছিল ফ্রাইডে।'

এভাবে এই নিঝুম দ্বীপে কেটে গেল সাতাশটি বছর। এই সাতাশ বছরে রবিনসনের আরও দুজন সঙ্গী হলো, ওরা কী করে এল শুনো।

পূর্বের মতো একদিন রবিনসন আবিষ্কার করল সমুদ্রতীরে তিনখানা নৌকা। রবিনসন দূরবীন দিয়ে দেখল, আগের মতোই কিছু বর্বর লোক দুটি লোককে বেঁধে রেখেছে, প্রহার করছে এবং আয়োজন চলছে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলবার। তখন রবিনসন আর ফ্রাইডে বন্দুক নিয়ে তাদের আক্রমণ করল। এতে মাত্র চারজন ছাড়া সবাইকে মেরে ফেলল ওরা দুজনে। বাকি চারজন আধমরা অবস্থায় কোনোরকমে ওদের এক নৌকা নিয়ে পালাল। ফ্রাইডে এবং রবিনসন তখন বন্দি দুজনকে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে সুস্থ করে তুলল। এদের একজন স্পেন দেশের লোক আর অন্যজন ফ্রাইডের স্বজাতি। ফ্রাইডে কিন্তু তাকে দেখেই চুমুতে চুমুতে গাল ভরে ফেলল। অস্থির করে তুলল লোকটিকে। কিছু পরে জানা গেল লোকটি আসলে ফ্রাইডের বাবা।

ওরা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে ওদের কাছ থেকে রবিনসন জানতে পারল ডাঙার কাছেই একটা জাহাজডুবি হয়েছে, তাতে কয়েকজন স্প্যানিশ এবং কয়েকজন পর্তুগিজ ছিল যাদের ধরে নিয়ে গেছে। এদিকে তাদের না আছে অস্ত্র, না আছে কোনো যন্ত্রপাতি। রবিনসন ওদের সব কথা শুনে নিজের দ্বীপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে সম্মত হলো, কিন্তু শর্ত হবে যে, তারা এখানে সবাই রবিনসনের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে এবং কখনো কেউ রবিনসনের বিরোধিতা করবে না। এই শর্তের কারণটাও রবিনসন ওদের বুঝিয়ে বলল, তা হলো, মানুষের সাধারণত স্বভাব হচ্ছে এমন, বিপদের সময় যে উপকার করে, বিপদ কেটে গেলে উপকারীর অপকার করতে ঐ মানুষের মনে বাধে না। এ ক্ষেত্রে বনের পশু বরং উত্তম প্রাণী।

রবিনসন আর ফ্রাইডে ওদের দ্বীপ থেকে ডাঙায় আনার জন্য একটা নৌকাতে ছাউনি তৈরি করল, সাথে রইল খাবার পানি। তারপর সেই নৌকা করেই ফ্রাইডের বাবা আর স্প্যানিশ খালাসিটি ঐ অভাগাদের উদ্ধারে যাত্রা করল।

আরও কিছুদিন পরে একদিন ফ্রাইডে এসে রবিনসনকে খবর দিল, দূরে আবারো একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। রবিনসন খবরটা পেয়ে বেশ খুশিই হলো- তবু মনের সন্দেহ দূর করতে কী উদ্দেশ্যে জাহাজটি এদিকে আসছে বুঝতে না পেরে আড়াল থেকে ব্যাপারটা পরখ করতে লাগল। ভাবখানা এই, দেখাই যাক না– কী হয়!

জাহাজ তীরের কাছে এসে নোঙর ফেলল, তারপর ঐ জাহাজের লোকেরা নৌকা করে এসে দ্বীপে নামল। আরও একটু সতর্কভাবে দেখে রবিনসন বুঝতে পারল ওরা সবাই শ্বেতাঙ্গ–ইংরেজ, ওর স্বজাতি। আর এই দলের তিনজন লোকের হাত-পা বাঁধা, ওরা বন্দি। যাই হোক, নৌকার লোকগুলো ঐ তিনজনকে চড়ায় ফেলে দিয়ে দ্বীপের ভিতর ঢুকল আর সেই ফাঁকে রবিনসন ওদের বন্দিত্বের কারণটা জেনে নিল।

ওরা বুঝতেই পারছিল না ওরা কোন জাতির লোক, কারণ কেউ কথার উত্তর দিচ্ছিল না। অবশ্য শেষে বুঝতে পারল ওরা রবিনসনেরই স্বজাতি। তাই তারা জানাল, জাহাজের খালাসিরা ষড়যন্ত্র করে ক্যাপ্টেন আর মেটদের বন্দি করেছে, তাদের ইচ্ছে ওদের এই নিঝুম দ্বীপে ফেলে জাহাজ নিয়ে পালাবে। রবিনসন ও ফ্রাইডে তাড়াতাড়ি ওদের বাঁধন খুলে দিল এবং তিনজনের হাতে তিনটি বন্দুক দিল আত্মরক্ষার জন্য। তারপর পাঁচজন মিলে ওদের খুঁজে বের করল। পুরো যুদ্ধের মতো আক্রমণ করল।

ঐ দুষ্টদলের চাঁই ছিল দুজন, প্রথমেই তাদের মেরে ফেলাতে সমস্ত ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেল। আর বাদবাকি যারা ছিল তারা সবাই রবিনসনের কাছে আত্মসমর্পণ করল। ক্যাপ্টেন তখন ঐ তিনজনের সাহায্যে তাদের বন্দি করে ফেলল।

রবিনসন ক্রুশোর জন্যে শুধু ওদের প্রাণই বাঁচাল না, জাহাজটি পর্যন্ত ফিরে পেল। আর সে কৃতজ্ঞতায় ওরা রবিনসনকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। রবিনসন ক্রুশো স্প্যানিশদের জন্যে অপেক্ষা না করে, যা–কিছু ব্যবহারের জিনিসপত্র ছিল সব গুছিয়ে রেখে সেগুলো তাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে ফ্রাইডেকে নিয়ে জাহাজে উঠল।

আটাশ বছর পরে এই এতদিনের অজানা দ্বীপ ছেড়ে রবিনসন ক্রুশো দেশের দিকে চলল এবং পঁয়ত্রিশ বছর পরে আবার দেশের মাটিতে পা দিল।

সার–সংক্ষেপ

রবিনসন ক্রুশো ইংল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল রবিনসন আইন পাস করে ওকালতি করবেন। কিন্তু রবিনের ঝোঁক ছিল দেশ–বিদেশ ঘুরে বেড়ানো। সেজন্য পিতামাতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে সমুদ্রযাত্রা করে। প্রথমে লন্ডনে যাত্রা করে কিন্তু তাকে বহনকারী জাহাজ ডুবে যায়। এরপর ব্যবসা করার জন্য সে গিনি উপকূলে যাত্রা করে। প্রথম যাত্রায় বেশ লাভ হওয়ায় দ্বিতীয়বার আবার সে গিনি উপকূলে যাত্রা করে। এবার মুর জলদস্যুর হাতে পড়ে সবকিছু হারিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। দু বছরের বেশি সময় দাস হিসেবে থাকার পর কৌশলে পালিয়ে ব্রাজিলে যায়।

ব্রাজিলে কয় বছর থাকার পর পুনরায় রবিনসন গিনি উপকূলে যাবার জন্য জাহাজে ওঠে। কিন্তু ঝড়ের কবলে পড়ে সব হারিয়ে একটি দ্বীপে ওঠে। এ দ্বীপে বসবাস শুরু করে। নির্জন দ্বীপে একাকী বাস করতে গিয়ে বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়। দুবার কিছু আদিবাসী বন্দি উদ্ধার করে। ৩৫ বছর পরে সে দেশে ফিরে আসে।

শব্দার্থ

সম্ভ্রান্ত – ভদ্র।

ওকালতি – আইন ব্যবসা।

সমুদ্রযাত্রা – সাগরপথে বিদেশ গমন।

পাউন্ড – ব্রিটিশ মুদ্রার নাম।

ভরসা – নির্ভরতা।

ধার – কর্জ

পন্থা – পথ, রাস্তা।

তুষ – ধানের খোসা।

অঙ্কুর – বীজ থেকে গজানো কচি চারা গাছ।

পরামর্শ – মন্ত্রণা, বিচার।

দুর্বুদ্ধি - খারাপ চিন্তা, দুষ্টবুদ্ধি ।

বাণিজ্য - ব্যবসা ।

ছাউনি - তাঁবু, শিবির ।

বীভৎস - বিকৃত, ভয়াল, অতি কদর্য ।

দূরবীন - দূরের জিনিস কাছে দেখার যন্ত্র ।

শ্বেতাঙ্গ - সাদা বর্ণের মানুষ ।

আবিষ্কার - উদ্ভাবন ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক্রুশোকে নিয়ে বাবার কী ইচ্ছে ছিল?

ক. ওকালতি করুক | খ. ব্যবসা করুক
গ. পর্যটক হউক | ঘ. নাবিক হউক

২. রবিনসন ক্রুশোর জাহাজটি কিসের কবলে পড়ল?

ক. ডাকাতের | খ. বর্বর লোকদের
গ. ঝড়ের | ঘ. হিংস্র জন্তুর

৩. রবিনসনকে দ্বীপের 'মুকুটহীন রাজা' বলতে বোঝানো হয়েছে–

i. দ্বীপের নির্বাচিত অধিপতি
ii. দ্বীপের মালিক
iii. দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii | খ. i ও iii
গ. iii | ঘ. ii ও iii

৪. নিচের অংশটুকু পড় এবং ৫ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

এবারে রবিনসনের ভাবনা—এগুলো মাড়াই করবে কীভাবে? তাছাড়া চাই জাঁতাকল আর রুটি সেঁকবার জন্য তাওয়া। যাই হোক, বুদ্ধিমান রবিন শক্ত কাঠ দিয়ে জাঁতা তৈরি করল, আর নরম মাটি থালার মতো পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করল তাওয়া।

৫. 'এগুলো মাড়াই করবে কীভাবে?'–এগুলো কী?

ক. গম ও যব | খ. ধান ও গম
গ. ধান ও যব | ঘ. যব ও ভুট্টা

৬. জাঁতাকল দিয়ে কী করা হয়?

ক. মাড়াইয়ের কাজ | খ. ধান ভাঙার কাজ
গ. ডাল ভাঙার কাজ | ঘ. চাষাবাদের কাজ

সৃজনশীল প্রশ্ন

৭. **অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রবিনসন ওদের সব কথা শুনে নিজের দ্বীপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে সম্মত হলো, কিন্তু শর্ত হবে যে, তারা এখানে সবাই রবিনসনের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে এবং কখনো কেউ রবিনসনের বিরোধিতা করবে না। এই শর্তের কারণটাও রবিনসন ওদের বুঝিয়ে বলল, তা হলো, মানুষের সাধারণত স্বভাব হচ্ছে এমন, বিপদের সময় যে উপকার করে, বিপদ কেটে গেলে উপকারীর অপকার করতে ঐ মানুষের মনে বাধে না। এক্ষেত্রে বনের পশু বরং উত্তম প্রাণী।

ক. রবিনসন কাদের সব কথা শুনে নিজের দ্বীপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে সম্মত হলো?

খ. অনুচ্ছেদে রবিনসনের বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।

গ. উদ্ধৃতিতে রবিনসনের উক্তিতে কৃতঘ্ন শ্রেণির মানুষের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– আলোচনা কর।

ঘ. 'এক্ষেত্রে বনের পশু বরং উত্তম প্রাণী'– উদ্দীপকের কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

সোহরাব রোস্তম

মূল: মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌস

রূপান্তর: মমতাজউদদীন আহমেদ

ইরানের পরাক্রমশালী রাজা ফেরিদুর কনিষ্ঠপুত্র রাজা ইরিজির কন্যা পরীচেহেরের পুত্র শাহ মনুচেহের যখন ইরানের রাজা হলেন, তখন তাঁর সৈন্যদলে নামকরা বীর যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন শাম নামে একজন বীর যোদ্ধা। শাম বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাই মনে অনেক দুঃখ। পুত্রের আশায় বীর শাম দেবতার মন্দিরে মাথা ঠুকে মরেন। অবশেষে দেবতার আশীর্বাদে বীর শাম এক পুত্র লাভ করলেন। পুত্রের নাম রাখলেন জাল।

বলিষ্ঠদেহী জাল দেখতে সুন্দর কিন্তু তার মাথার সব চুল ধবধবে সাদা। সাদা রঙের চুলওয়ালা ছেলে অভিশাপ ডেকে আনতে পারে। এই রকম নানা আশঙ্কার কথা শুনে শাম নিজের হাতে নিজের পুত্রকে ফেলে এলেন আলবুরুজ পর্বতে। কিন্তু দেবতারা ছিল শিশু জালের প্রতি দয়াশীল। ইগল পাখির মতো ঠোঁট এবং সিংহের মতো পা–বিশিষ্ট সি–মোরগ পাখি উড়ে এসে ঠোঁটে ঝুলিয়ে জালকে নিয়ে গেল। জাল পাখির বাসায় বড় হতে লাগল।

পুত্রকে ফেলে এসে বীর শাম পুত্রশোকে কাতর হয়ে দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি আবার দেবতার মন্দিরে ছেলের জন্য মাথা ঠুকতে লাগলেন। সি–মোরগ পাখি জালকে ফেরত দিয়ে গেল এবং যাবার সময় নিজের পাখনা থেকে একটি পালক ছিঁড়ে উপহার দিয়ে বলল 'বিপদের সময় এ পালকটি আগুনে তাতালেই আমি সাহায্যের জন্য ছুটে আসব।'

বাদশাহ মনুচেহের কিশোর জালকে দেখে খুশি হলেন। জালকে উপহার দিলেন তেজি ঘোড়া এবং শামকে দিলেন জাবুলিস্তানের শাসনভার। ক্রমে ক্রমে জাল অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। পিতা শাম গেলেন রাজার আদেশে মাজেন্দ্রানের দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যুবক জাল জাবুলিস্তানের শাসনভার পরিচালনা করছে।

একবার যুবক জাল গেলেন কাবুল–রাজা মেহেরাবের রাজ্যে বেড়াতে। রাজা মেহেরাবের সুন্দরী কন্যা রুদাবার সঙ্গে প্রণয় হলো জালের এবং অবশেষে সকলের সম্মতি নিয়ে জাল ও রুদাবার বিবাহ সম্পন্ন হলো।

আনন্দে দিন কাটে নবদম্পতির। কিছুদিনের মধ্যে রুদাবার হলো কঠিন অসুখ। কত ওষুধ, বদ্যি, কিন্তু অসুখ সারে না। জাল তখন সি–মোরগের পালক ধরল আগুনের তাপে। সি–মোরগ উড়ে এসে হাজির হলো। সি–মোরগ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রোগিণীর রোগ পরীক্ষা করে বলল, ওহে ভাগ্যবান জাল, তুমি অতিসত্বর পিতা হতে চলেছ। তোমার পত্নী রুদাবা এমন এক সন্তানের মা হতে চলেছে, যে সন্তানের নাম পৃথিবীতে খ্যাত হবে তার বীরত্ব ও সাহসের গুণে।

সি–মোরগের কথা মিথ্যা হবার নয়। জাল এক শক্তিমান এবং বলবান পুত্রসন্তান লাভ করলেন। এই ছেলেই মহাবীর রোস্তম। ইরানের জাতীয় ইতিহাসে যার নাম এখনো অক্ষয় অমর হয়ে আছে।

শৈশবেই রোস্তমের মধ্যে বীরত্বের লক্ষণ ফুটে উঠল। সে তেজি ঘোড়ায় চড়ে দুরন্তবেগে ছুটতে ভালোবাসে, আর ভালোবাসে গদা ও গর্জ নিয়ে যুদ্ধ করতে। সামান্য খাদ্যে তার ক্ষুধা মেটে না। এক দাইমায়ের দুধপান করে তার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সে পাঁচটি ছাগলের মাংসের কাবাব দিয়ে প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করে।

একদিন রাজার মত্ত হাতি শিকল ছিঁড়ে রাজপথে ছুটছে। হাতির পায়ের নিচে পড়ে মানুষ জীবন দিচ্ছে কিন্তু সাহস করে কেউ মত্ত হাতির মুখোমুখি হচ্ছে না। কিশোর রোস্তম গদা নিয়ে পাগলা হাতির সামনে ছুটে এল এবং গদার এক আঘাতে হাতিকে ধরাশায়ী করল। বীর রোস্তম অজেয় সোপান্দি দুর্গে কৌশলে প্রবেশ করে দুর্গের সর্দার ও সিপাহিদের হত্যা করে পিতামহের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এল। পিতা জাল বীরপুত্র রোস্তমকে আলিঙ্গান করলেন। কেননা তিনি বারবার এ দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন। আজ পুত্রের শৌর্যে পিতার বুক গর্বে ফুলে উঠেছে।

তুরানের সেনাপতি আফরাসিয়াব ইরান আক্রমণ করে রাজা নওদরকে হত্যা করলেন এবং জালের রাজ্য জাবুলিস্তান আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন। পিতা জালের সঙ্গে পুত্র রোস্তমও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধসাজ পরলেন। আস্তাবলে প্রবেশ করে সবচেয়ে দুরন্ত ও অবাধ্য যে ঘোড়া রখ্‌শ তাকেই নির্বাচন করলেন রোস্তম। রাক্ষসবংশের রখ্‌শ এতদিনে প্রকৃত মনিবকে পেয়ে মহানন্দে হ্রেষাধ্বনি করল। বীর রোস্তম রংধনু রঙের রেশমি পোশাক পরল। মাথায় তাজের ওপর ঝুলাল রেশমের বর্ণাঢ্য রুমাল আর হাতে তুলে নিল পিতামহ শামের সেই বিখ্যাত গদা।

রোস্তম যুদ্ধে চলল, কিন্তু বুকে ও বাহুতে নেই লোহার বর্ম। যে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। যুদ্ধে তুরাণি সৈন্যদের পিছু হটতে হলো। তরুণ রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে স্বয়ং সেনাপতি আফরাসিয়াব কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালালেন।

বীর রোস্তম হলেন ইরানের মহাবীর রোস্তম। রোস্তম ইরানের স্বাধীনতা উদ্ধার করলেন। রাজা কায়কোবাদ রাজসিংহাসনে বসলেন। জনগণ মহাবীর রোস্তমের জয়গানে ইরান মুখরিত করল। সুখে-শান্তিতে ইরানবাসী দিনাতিপাত করতে লাগল।

কিন্তু রাজা কায়কোবাদের পর রাজা কায়কাউস রাজা হলেন। কায়কাউস ছিলেন খেয়ালি এবং চাটুকারিতাপ্রিয় রাজা। চাটুকারদের প্রশংসায় বিভ্রান্ত হয়ে কায়কাউস দৈত্যদের রাজ্য পাহাড়ি দেশ মাজেন্দ্রান জয় করতে ছুটে গেলেন। মাজেন্দ্রানের রাজা প্রতিবেশী বন্ধু মহাবলী সফেদ দৈত্যের সাহায্যে রাজা কায়কাউসের বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে রাজা কায়কাউসকে বন্দি করে রাখলেন।

ইরান রাজার এ বন্দিদশার সংবাদ পৌঁছাল জাবুলিস্তানে। মহাবীর রোস্তম রখ্‌শের পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটলেন দৈত্যরাজ্য মাজেন্দ্রানে। দীর্ঘ পথ, পায়ে পায়ে বিপদ আর ছলনা। অপরিসীম মনোবলের অধিকারী রোস্তম সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অবশেষে আলবুরুজ পর্বত ডিঙিয়ে এলেন মাজেন্দ্রানে। রোস্তমের গদার আঘাতে একে একে শত্রু ভূপাতিত হলো। রাজা কায়কাউস মুক্ত হলেন।

কিন্তু ভয়ংকর লোমশ প্রাণী সফেদ দেও–এর রক্ত না হলে অন্ধ রাজার চক্ষু ভালো হবে না। মহাবীর রোস্তমের সঙ্গে মহাবলী সফেদ দেও সম্মুখযুদ্ধ শুরু করল। মনে হয় এমন প্রলয়ংকর যুদ্ধ পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি এবং

ভবিষ্যতেও ঘটবে না। দুই বীর যোদ্ধাই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হলেন। অবশেষে মহাবীর রোস্তমের আঘাতে সফেদ দেও–এর কোমর ভেঙে গেল। রোস্তম তলোয়ার দিয়ে সফেদ দেও–এর গলা দ্বিখণ্ডিত করলেন।

অন্ধ রাজা কায়কাউস দেও–এর রক্তের ফোঁটা পেয়ে দৃষ্টি ফিরে পেলেন। আবার ইরানে শান্তি ফিরে এল। রোস্তম ফিরে গেলেন জাবুলিস্তানে।

মহাবীর রোস্তম একবার প্রিয় ঘোড়া রখ্‌শের পিঠে চড়ে বেরিয়েছেন শিকার করতে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়েছেন তুরানের কাছে এক জঙ্গলে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে মনিব এবং অশ্ব দুজনই ক্লান্ত। বড় গাছের নিচে রোস্তম শুয়ে পড়েছেন। প্রগাঢ় ঘুমে তিনি নিমগ্ন। পাশেই প্রিয় রখ্‌শ ঘাস খাচ্ছে।

তখন নিশুতি রাত। রখ্‌শ আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। সে সময় একদল তুরানি সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়া চুরি করাই তাদের ব্যবসা। রখ্‌শকে দেখে ওরা লোভ সামলাতে পারল না। ভুলিয়ে ভালিয়ে সে রাতেই ওরা রখ্‌শকে নিয়ে তুরান পালিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াচোররা জানতেও পারল না তারা কার প্রিয় ঘোড়া নিয়ে পলায়ন করছে।

সকালের সূর্যের স্নিগ্ধ আলোয় এবং অরণ্যে পাখির কূজন শুনে মহাবীর রোস্তমের ঘুম ভাঙল। তিনি অভ্যাস মতোই প্রিয় রখশের নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমন তো কখনো হয়নি! রোস্তম এখানে সেখানে খুঁজলেন, অবশেষে বনের প্রান্তে ধুলোর মধ্যে রখ্‌শের খুরের দাগ দেখে ঠিকই বুঝলেন তুরানি ঘোড়াচোররা তার প্রিয় রখ্‌শকে নিয়ে পালিয়েছে।

খুরের দাগ অনুসরণ করে ক্রোধে উন্মত্ত মহাবীর রোস্তম সামেনগান শহরে উপস্থিত হলেন। মহাবীর রোস্তমকে চেনে না কে? যারা কোনোদিন চোখে দেখেনি তারাও এই বিশালদেহী মহাবীরকে দেখেই বুঝতে পারল ইনিই ইরানের বীর রোস্তম। বীরের ক্রোধবহ্নি মিশ্রিত চক্ষু দেখে সকলে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। সামেনগান অধিপতির নিকট সংবাদ গেল, তিনি দ্রুত ছুটে এলেন মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে। ইতোমধ্যে সামেনগান অধিপতি তাঁর নগরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য চতুর্দিকে লোক–লস্কর ছুটিয়ে দিয়েছেন ঘোড়াচোরদের গ্রেফতার করার জন্য।

সামেনগান অধিপতির বিনীত বাক্যে আপাতত তুষ্ট হয়ে রোস্তম এলেন প্রাসাদে রাজঅতিথি হয়ে। রোস্তমের সম্মানে বিরাট ভোজের আয়োজন হলো। নৈশভোজ শেষ করে পরিতুষ্ট রোস্তম গেলেন রাজশয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করতে।

হাতির দাঁতের পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে রোস্তমের চোখে তন্দ্রার ভাব এসেছে, তখন মনে হলো এক অপরূপ সুন্দরী তাঁর শয্যাপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরীর স্নিগ্ধ সরল রূপমাধুর্য দেখে রোস্তম বিমোহিত হলেন। রোস্তমের তন্দ্রা কেটে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে দেখলেন স্বপ্নে আর বাস্তবে কোনো ভেদ নেই, সত্যিই এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা তাঁর শিয়রের প্রান্তে দণ্ডায়মান। রোস্তম বললেন, কে তুমি রমণী? রমণী সলজ্জ নেত্র তুলে বলল, আমি তহমিনা। সামেনগান অধিপতি আমার পিতা। আপনার বীরত্ব ও শৌর্যের কথা শুনে এতদিন আপনাকে নিয়ে স্বপ্নের মধুর জাল বুনেছি। আপনার বীরত্বে আমি এতকাল অর্ঘ্য নিবেদন করেছি। সত্যিই যখন আজ আপনি আমাদের মহান অতিথি হয়ে এসেছেন, তখন জানাতে এসেছি আমি এতকাল আপনাকেই স্বামীত্বে বরণ করেছি।

এই কথা বলে হাওয়ার দোলায় ভেসে তহমিনা ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু ঘরের বাতাসে রেখে গেল তার মধুর দোলা এবং মহাবীর রোস্তমের অন্তরে রেখে গেল এক অনাস্বাদিত মধুর ঝংকার।

মহাবীর রোস্তম আর ঘুমাতে পারলেন না। সকালের প্রথম আলো জানালা দিয়ে ঢোকার সঙ্গো সঙ্গোই রোস্তম ছুটে গেলেন সামেনগান অধিপতির কাছে। রোস্তম নিঃসঙ্কোচে প্রস্তাব করলেন, তিনি তহমিনাকে বিবাহ করবেন। সামেনগান অধিপতি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। মহাবীর রোস্তম হবে তার জামাতা, এ যে ধারণার অতীত। তিনি সানন্দে রাজি হলেন এবং সঙ্গো সঙ্গো মহাসমারোহে বিয়ের আয়োজন করতে ছুটে গেলেন।

মহা উৎসব, বিপুল আয়োজনের মধ্যে জাঁকজমক সহকারে রোস্তমের সঙ্গো তহমিনার বিবাহ হয়ে গেল। রাত্রির চাঁদ বাতায়নে দাঁড়াল। নিশাবসানের পূর্বে মহাবীর রোস্তম প্রিয় স্ত্রীর চিবুক স্পর্শ করে বললেন–যদি আমাদের পুত্রসন্তান হয় তা হলে এই তাবিজটি তার হাতে পরিয়ে দিও, আর যদি কন্যাসন্তান হয় তাহলে এ তাবিজ তার চুলে বেঁধে দিও। এ তাবিজের ভিতর আমি নিজের নাম স্বাক্ষর করে রেখেছি।

তহমিনা ছলছল চোখে স্বামীর দিকে তাকায়। রোস্তম সেই জলভরা চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি বীরের স্ত্রী, কান্না তোমার শোভা পায় না। আমি আজই ইরান ফিরে যাব, শত্রুরা আবার প্রিয় ইরানের স্বাধীনতা হরণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

তহমিনা বিচ্ছেদব্যথায় কাতর হয়ে হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মহাবীর রোস্তম বাধা দিয়ে বললেন বীরের প্রকৃত স্থান যুদ্ধের ময়দান, যুদ্ধেই তোমার স্বামীর প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠবে।

প্রিয় অশ্ব রখ্শের পিঠে চড়ে মহাবীর রোস্তম ইরানের পথে চলে গেলেন। ঝরোকার উপর চোখ রেখে হতভাগিনী তহমিনা স্বামীর চলে যাওয়া দেখল। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর মাথার সোনার মুকুট দেখা গেল, তহমিনা অপলক দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর যখন আর কিছুই দেখা গেল না, শুধু অশ্রুধারায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। তখন স্বামীর ফেলে যাওয়া শয্যায় আছড়ে পড়ে ব্যাকুল ভাবে কাঁদল। ইরানের অগ্নিদেবতা কি জানতে পেরেছিল তহমিনা কেঁদে কেঁদে বলেছিল–ওগো আমার ভাগ্যদেবতা, আমাকে তুমি পুত্র-সন্তানের মা হতে দাও, যেন পুত্রের মুখ দেখে আমি বীর স্বামীকে হারানোর দুঃখ ভুলে থাকতে পারি।

হয়তো তহমিনার করুণ আবেদন সৃষ্টিকর্তা শুনেছিল। যথাসময়ে সুন্দরী তহমিনার কোল আলো করে এক পুত্র সন্তান এল। সকলেই মহাখুশি। সামেনগান অধিপতি নাতির নাম রাখলেন সোহরাব। মহাবীর রোস্তমের পুত্র সোহরাব। কিন্তু মা তহমিনার বুক সেদিন ক্ষণকালের জন্য হলেও কেঁপে উঠেছিল। তহমিনা যদিও ছেলের হাতে রোস্তমের দেওয়া তাবিজ পরিয়ে দিলেন কিন্তু রোস্তমের কাছে দূত মারফত সংবাদ পাঠালেন তাদের একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

দূতমুখে কন্যার সংবাদ পেয়ে রোস্তম বিমর্ষ হলেন। আশা করেছিলেন তিনি পুত্রের পিতা হবেন।

রোস্তম একরকম জোর করেই তহমিনার কথা ভুলে থাকতে চাইলেন।

মহাবীর রোস্তম ইরানের ভরসা। যুদ্ধক্ষেত্র নিয়েই তাঁর দিনরাত্রি কেটে যায়। এদিকে সোহরাব দিনে দিনে আপন মহিমা ও শৌর্য নিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। যেমন তার বিশাল দুটি বাহু, তেমনি উদার প্রশস্ত বক্ষ একবার দেখলে বারবার দেখতে হয়। হবেই না কেন? রোস্তমের পুত্র আর এক অতুলনীয় বীর হয়ে পৃথিবীতে আসছে। জাল যার পিতামহ, শাম যার প্রপিতামহ এবং স্বয়ং রোস্তম যার পিতা, সেই পুত্র সোহরাব কি আবার সামান্য বীর হবে! সেও দুরন্ত অশ্বের কেশর ধরে টান মারে, এক থাবায় বাঘের মুখকে চুরমার করে। তলোয়ার, বর্শা ও গদাযুদ্ধে সোহরাব সামেনগানের বীর বলে পরিচিত হলো।

একদিন কিশোর সোহরাব এসে মাকে বলল, মা আমার সমবয়সীরা সকলেই বাবার কথা বলে। আমি বাবার কথা কিছুই বলতে পারি না। তাহলে কি আমার বাবা যুদ্ধক্ষেত্রে অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন?

তহমিনা ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল–না সোহরাব, তোমার বাবা জীবিত আছেন। তিনি ইরানের মহাবীর রোস্তম। এই দেখো তোমার বাজুতে বাঁধা রয়েছে তোমার বাবার দেওয়া তাবিজ। এই তাবিজে তাঁর নাম লেখা আছে।

সোবহার বাবার কথা শুনে, বাবার বীরত্বের মহিমা জানতে পেরে মাকে বলল– মা, আমি বাবার কাছে যাব বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলব, পিতা, আমি তোমার স্নেহের পুত্র সোহরাব।

মা তহমিনা ছেলের মুখে আদরের চুম্বন দিয়ে বলল, তুই চলে গেলে আমি কী নিয়ে থাকব। সোহরাব, তোকে কাছে পেলে তোর বাবা কোনোদিন তোকে আমার কাছে ফেরত পাঠাবে না।

তহমিনার অশ্রুসজল চোখ দুটি মুছিয়ে স্নেহময় কণ্ঠে সোহরাব বলল, কিন্তু বাবাকে না দেখলে আমার জীবন যে অপূর্ণ থেকে যাবে মা।

ইরানে আর তুরানে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। রাজা কায়কাউসের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ইরানের চিরশত্রুরা আবার তাদের পরাজয়ের শোধ নেওয়ার জন্য সাজ সাজ রব তুলেছে। মাজেন্দ্রান জয়ের পর পার্শ্ববর্তী সব দেশই ইরানের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কেবল হামাউনের রাজা অধীনতা স্বীকার করলেন না।

রাজা কায়কাউস হামাউন আক্রমণ করলেন। হামাউনের রাজা মাত্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে এক পাহাড়ি কেল্লায় পলায়ন করলেন। হামাউনের রূপসী কন্যা রুদাবার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা কায়কাউস তাকে বিবাহ করলেন।

কিন্তু হামাউন মনে মনে এ বিবাহ স্বীকার না করলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। রাজা হামাউন সুযোগ বুঝে কন্যা ও জামাতাকে পাহাড়ি দুর্গে আমন্ত্রণ জানাল। রাজা কায়কাউস শ্বশুরের আমন্ত্রণ পেয়ে সরল মনেই পাহাড়ি কেল্লায় গেলেন। তাঁর আদর আপ্যায়ন কম হলো না। কিন্তু কায়কাউস বুঝতে পারলেন তিনি শ্বশুরের দুর্গে বন্দি হয়েছেন। এ খবর বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ল। ইরানের শত্রুরা এবার কঠিন আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলো। সবার আগে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছুটে এল তুরানের রাজকুমার আফরাসিয়াব।

সামেনগান তুরান রাজ্যেরই একটি নগর। সামেনগানের বীর সোহরাবও এ যুদ্ধে একজন সেনাপতি হয়ে তুরানের পক্ষে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল।

মা তহমিনার বুক আর একবার কেঁপে উঠল। সে ছুটে এসে সোহরাবের পথ রোধ করে বলল, সোহরাব তুই এ যুদ্ধে যাসনে। এ ভয়ংকর যুদ্ধ, না জানি কী এক দুঃসহ ঘটনা ঘটাবে।

সোহরাব মাকে বলল, আমি তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছিনে মা, আমি যাচ্ছি বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাবার সঙ্গে দেখা করে আমি নিজে তাঁর মাথায় ইরান-তুরানের মিলিত মুকুট পরিয়ে দেব।

দ্রুতগতির অশ্বে চড়ে কিশোর সোহরাব বাবার সঙ্গে প্রথম দেখা করার জন্য ছুটে চলে গেল। তহমিনা সেদিনের মতো আজও ঝরোকায় চোখ রেখে ছেলের যাওয়া দেখল। যতক্ষণ ঐ লাল ঘোড়াটি দেখা যাচ্ছিল, ঘোড়ার পিঠে স্নেহের সোহরাবকে দেখল মা। তারপর অশ্রুতে ঝাপসা হলো তার চোখ। তহমিনা শয্যায় পড়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদল। আজও কি দেবতারা তার কান্না শুনতে পেল? তহমিনা কেঁদে কেঁদে দেবতার উদ্দেশে বলল– আমার সোহরাবকে অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করো, হে অগ্নিদেবতা।

তুরান যখন ইরান আক্রমণ করে তখন মহাবীর রোস্তম ছিলেন জাবুলিস্তানে। রাজা কায়কাউস দূত মারফত মহাবীরকে অনুরোধ করে পাঠালেন ইরানের এ দুর্দিনে ছুটে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে।

যুদ্ধের দামামা শুনে প্রকৃত বীর কি ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে? যুদ্ধের আহ্বান শুনে প্রিয় রখ্‌শ ছুটিয়ে মহাবীর রোস্তম এলেন ইরানে। ইরানের ভরসা রোস্তম এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

ইরান ও তুরান দুই প্রতিপক্ষ বাহিনীর যুদ্ধশিবির পড়েছে একই মাঠের দুই দিকে। তুরানি শিবিরের দিকে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কিশোর সোহরাব দেখছে ইরানের শিবির আর ভাবছে কোন ছাউনির মধ্যে তার বীর পিতা রয়েছেন। কেমন করে নির্জনে নিরালায় পিতার সঙ্গে তার দেখা হবে।

সোহরাব মনে মনে এক বুদ্ধি ঠিক করল। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নির্জনে তার পিতার সঙ্গে মিলিত হবে।

তুরানের দূত গেল ইরানের শিবিরে। তুরানের বীর কিশোর সোহরাব, দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান করেছেন প্রবীণ রোস্তমের বিরুদ্ধে। দূতের মুখে এ আহ্বান শুনে রোস্তম মৃদু হাসলেন। বালকের সাহস তো কম নয়! কে এই দুর্দম বালক? রোস্তম নিজের পরিচয় গোপন রেখে এ আহ্বানে সাড়া দিলেন নিতান্তই কৌতূহল বশে।

দুই শিবির থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন রোস্তম আর সোহরাব। নির্জন গিরিপথে পিতা-পুত্রের দেখা হলো। পুত্র দেখল পিতাকে আর পিতা দেখল পুত্রকে। কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। রোস্তম বালক সোহরাবকে বললেন, ওহে বালক, তোমার মায়ের চিত্তে কি ভয় নেই? কোন সাহসে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছেন? জীবনের মায়া থাকে তো এখনই পলায়ন করো।

সোহরাব বলল, আপনি কি সেই মহাবীর রোস্তম? বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রোস্তম লজ্জা পেল বলল, না। রোস্তম এখন জাবুলিস্তানে। আমি রোস্তমের একজন ভৃত্য মাত্র।

সোহরাবের মন হতাশায় আচ্ছন্ন হলো। তবু যুদ্ধ শুরু হলো। বর্শা ভাঙল, তলোয়ার খানখান হলো। দুই বীরের শরীর রক্তাক্ত হলো। দিবসের শেষ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ল। সোহরাবের গদার আঘাতে রোস্তম কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছেন। সেদিনের মতো যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে সোহরাব বলল, আজ সন্ধি করলাম, কাল আমাদের হারজিতের পরীক্ষা হবে।

দুই বীর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। রোস্তম ভাবেন, কে এই বালক? তার বাহুতে এত শক্তি কোথা থেকে এল? আর সোহরাব ভাবে, কীজন্য এলাম যুদ্ধ করতে, যদি আমার বাবা জাবুলিস্তানেই থেকে গেল?

পরের দিন আবার সেই নির্জন স্থানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সোহরাব পুনরায় জিজ্ঞেস করল, অনুগ্রহ করে বলুন আপনি কি সত্যি মহাবীর রোস্তম নন? যদি রোস্তম হন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

রোস্তম তখন ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ করে সোহরাবকে উত্তেজিত করছেন : ওহে মূষিকপ্রবর, রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করা দুগ্ধপোষ্য বালকের কাজ নয়। আগে আমাকে পরাজিত করো, তবেই রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করার আস্পর্ধা করো।

সোহরাব এবার উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে রোস্তমকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল। রোস্তম সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন। সোহরাব তাঁর বুকের উপর বসে অস্ত্রের আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। রোস্তম কৌশল করে বললেন, এ তোমার কোন বীরত্বের রীতি? শত্রুকে পরপর দুবার পরাজিত না করলে তাকে প্রাণে বধ করা যায় না। ইরানের এই যুদ্ধরীতিকে তুমি অস্বীকার করতে চাও?

সোহরাব রোস্তমকে ছেড়ে দিল। সেদিনের মতো সন্ধি, আবার আগামীকাল যুদ্ধ।

তৃতীয় দিন আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সোহরাব দেখছে রোস্তমকে। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার সে দেখছে রোস্তমের দিকে। রোস্তমের আজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সামান্য এক বালকের হাতে পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে রাজি নন।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। কিন্তু আনমনা সোহরাবকে আজ রোস্তম ধরাশায়ী করে ফেললেন।

সোহরাবকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই প্রথম সুযোগে রোস্তম তীক্ষ্ণধার তলোয়ার বের করে সোহরাবের বুকে

ঢুকিয়ে দিলেন। সোহরাবের তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কোথায় গেল ইরানের যুদ্ধের নিয়ম, কোথায় গেল মহাবীর রোস্তমের বীরত্ব। সোহরাব যন্ত্রণায় এবং ক্ষোভে ক্রন্দন করে বলল, শোনো ইরানি কাপুরুষ। তুমি অন্যায় যুদ্ধে প্রথম পরাজয়ে আমাকে প্রাণে বধ করলে। কিন্তু এ সংবাদ যখন আমার বাবা জানতে পারবেন তখন তুমি সাগরের অতলেই থাকো, কিংবা আকাশে নক্ষত্রের মধ্যে পলায়ন করো, তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

রোস্তম বলল, কে তোমার বাবা?

সোহরাবের বুক থেকে তখন রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। ক্লান্ত অবসন্ন সোহরাব বলল, মহাবীর রোস্তম আমার বাবা, আর সামেনগানের অধিপতির কন্যা তহমিনা আমার মা।

সহস্র বজ্রপাতের মতো মহাবীর রোস্তমের কানে সোহরাবের শেষ কথাগুলো শেলবিদ্ধ হলো। রোস্তম আর্তনাদ করে বলল, মিথ্যা কথা, ওরে বালক মিথ্যা কথা! আমার কোনো পুত্রসন্তান নেই। তহমিনা আমাকে সংবাদ দিয়েছে, আমার কন্যাসন্তান হয়েছে।

সোহরাব শেষবারের মতো চক্ষু মেলে বাবার দিকে দৃষ্টিপাত করে তার হাত তুলে দেখাল, সেখানে একটি তাবিজ বাঁধা আছে। সোহরাব বলল, বাবা আমার আর কোনো দুঃখ নেই। সোহরাবের চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

সোহরাবের নিস্পন্দ দেহ পিতার বক্ষে আশ্রয় লাভ করল।

তখন নির্জন গিরিপথে কোনো প্রাণী ছিল না, আকাশের সূর্য এসে সোহরাবের মুখে পড়েনি, কোনো বিদায় রাগিণী বেজে উঠে সেই বিদায় দৃশ্যকে বিহ্বল করেনি। তবু রোস্তমের বুকফাটা হাহাকার, ফিরে আয় মানিক। প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে এসে বারবার বলছিল, নেই সোহরাব নেই।

দিবসের শেষ সূর্য যখন পর্বতের ওপারে ঢলে পড়ল, তখনো হতভাগ্য মহাবীর রোস্তম ছেলের প্রাণহীন দেহ বক্ষে ধারণ করে বারবার বলছে– আয় সোহরাব, ফিরে আয়।

সার–সংক্ষেপ

প্রাচীন ইরানের জাতীয় বীরযোদ্ধা রোস্তম তাঁর অতুলনীয় শক্তি ও সাহসের জন্য পৃথিবীর মানুষের কাছে কিংবদন্তির নায়ক। রোস্তম একজন জাতীয় বীর। তাঁরই পুত্র সোহরাব পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। রোস্তমের জীবন অত্যন্ত করুণ ও মর্মন্তুদ। মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসীর 'শাহনামা' মহাকাব্যটি প্রাচীন ইরানের রাজা বাদশাহ ও বীরপুরুষদের কাহিনী। কথিত আছে, গজনির সম্রাট সুলতান মাহমুদ কবি ফেরদৌসীকে 'শাহনামা' কাব্য রচনার অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবির রচিত প্রতিটি শ্লোকের জন্য একটি করে সোনার মোহর দেবেন। সুলতান শেষ পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় কবি খুব দুঃখ পান। সুলতান অবশ্য পরে তাঁর এ ভুল বুঝতে পেরে কবির কাছে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কবি আর তখন জীবিত ছিলেন না।

শব্দার্থ

আশঙ্কা – ভয়।

শৌর্য – বীরত্ব।

হ্রেষাধ্বনি – ঘোড়ার ডাক।

বিভ্রান্ত – ভুল পথে যাওয়া।

বন্দিদশা – বন্দি অবস্থা।

ভূপাতিত – মাটির উপর পড়া।

লোমশ – লোমে ভরা, লোমবহুল।

ক্রোধবহ্নি – রাগের আগুন, রাগান্বিত।

নৈশভোজ – রাতের খাবার।

তন্দ্রা – ঘুম।

সলজ্জ – লজ্জামিশ্রিত।

অপলক – পলকহীন। চোখের পাতা পড়ে না এমন।

ক্ষান্ত – সমাপ্ত।

মূষিক – ইঁদুর।

দুগ্ধপোষ্য – দুধ খাইয়ে পালন করতে হয় যাকে।

গ্লানি – ক্লান্তি।

নিস্পন্দ – স্থির।

বিলাপ – ক্রন্দন, শোকপ্রকাশ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'সোহরাব ও রোস্তম' কাহিনীর মূল লেখক কে?

ক. মালিক মুহম্মদ জায়সী খ. ওমর খৈয়াম

গ. ইমরুল কায়েস ঘ. আবুল কাসেম ফেরদৌসী

২। বয়:ক্রমিক অনুসারে নামগুলো হলো–

i. শাম, জাল, রোস্তম, সোহরাব

ii. জাল, সোহরাব, রোস্তম, শাম

iii. সোহরাব, রোস্তম, জাল, শাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

৩. উদ্ধৃত অংশটি পড় এবং ৪ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাদা রঙের চুলওয়ালা ছেলে অভিশাপ ডেকে আনতে পারে। এই রকম নানা আশঙ্কার কথা শুনে শাম নিজের হাতে নিজের পুত্রকে ফেলে এলেন আলবুরুজ পর্বতে। কিন্তু দেবতারা ছিলেন শিশু জালের প্রতি দয়াশীল। ইগল পাখির মতো ঠোঁট এবং সিংহের মতো পা বিশিষ্ট সি-মোরগ পাখি উড়ে ঠোঁটে ঝুলিয়ে জালকে নিয়ে গেল। জাল পাখির বাসায় বড় হতে লাগল।

৪. উদ্ধৃত অংশটি একটি –

ক. রূপকথার অংশ খ. উপকথার অংশ

গ. জনশ্রুতিমূলক গল্পাংশ ঘ. ঐতিহাসিক গল্পাংশ

৫. উদ্ধৃতাংশে আছে –

ক. সাধারণ মানুষের কথা খ. রাজরাজাদের কথা

গ. সৈন্যসামন্তদের কথা ঘ. দেবতাদের কথা

৬. উদ্ধৃতাংশে ব্যক্ত হয়েছে সে সময়কার–

i. অন্ধ কুসংস্কার

ii. ধর্মীয় বিশ্বাস

iii. সামাজিক প্রথা

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii   খ. ii

গ. iii   ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

৭. নিচের উদ্ধৃতিটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সোহরাব যন্ত্রণায় এবং ক্ষোভে ক্রন্দন করে বলল, শোনো ইরানি কাপুরুষ। তুমি অন্যায় যুদ্ধে প্রথম পরাজয়ে আমাকে প্রাণে বধ করলে। কিন্তু এ সংবাদ যখন আমার বাবা জানতে পারবেন তখন তুমি সাগরের অতলেই থাকো, কিংবা আকাশে নক্ষত্রের মধ্যে পলায়ন করো, তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

ক. রোস্তম যুদ্ধনীতির কোন বৈশিষ্ট্য ভঙ্গ করেছেন?

খ. সোহরাব যুদ্ধটিকে অন্যায়যুদ্ধ বলেছে কেন?

গ. উদ্ধৃতাংশে সোহরাবের সংলাপে রোস্তমের প্রতি যে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে, গল্পে রোস্তম চরিত্রে তার কতটুকু প্রকাশ ঘটেছে?– বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে রোস্তমের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

মার্চেন্ট অব ভেনিস

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার

ইতালির ভেনিস শহরে ছিল এক সওদাগর। নাম তার অ্যান্টনিও। সদা হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল। বিপদ–আপদে অভাবগ্রস্তরা ছুটে আসে তার কাছে। মুক্তহস্ত অ্যান্টনিও কাউকেই শূন্যহাতে ফেরায় না। চারদিকে তার নামের প্রশংসা।

কিন্তু অ্যান্টনিওর এই যশ প্রতিপত্তির ধাক্কা গিয়ে লাগে আর একটি অন্তরে। সেও একজন ব্যবসায়ী। তবে সুদের ব্যবসা করে। কাউকে বেকায়দায় পেলে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। ধার পরিশোধের সময় ঋণগ্রহীতাকে সর্বস্ব খোয়াতে হয়। ভেনিসের মানুষ তাই কেউ তাকে বরদাস্ত করতে পারত না। এই ব্যবসায়ীর নাম শাইলক। জাতে ইহুদি। অ্যান্টনিওকে সংগত কারণেই সে দুচোখে দেখতে পারত না। অপরপক্ষে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী অ্যান্টনিও ঘৃণার চোখে দেখত তাকে। সে বিধর্মী বলে নয়। শাইলকের নীতি সম্পর্কে সে বন্ধুমহলে মাঝে মধ্যে কঠোর ভাষায় সমালোচনাও করত।

শাইলক সুচতুর ও অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। সে অ্যান্টনিওর ব্যবসার লাভ–লোকসান আর নিজের সুদের ব্যবসা মূলত একই পর্যায়ে বিবেচনা করত।

তবে অ্যান্টনিওর এই উদারনীতির জন্য শাইলকের সুদের ব্যবসার যে বহু ক্ষতি হচ্ছিল— একথা মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সে মনেপ্রাণে অ্যান্টনিওর ধ্বংস কামনা করত।

অ্যান্টনিওর বন্ধুর অভাব নেই। বন্ধুমহলের মধ্যে বাসানিও ছিল তার অন্তরঙ্গ। একদিন ম্লান মুখে এসে অ্যান্টনিওকে জানাল, পোর্শিয়া নামের একটি সুন্দরী যুবতীর বিয়ে হচ্ছে, বহু ধনরত্নের মালিক সে। আর তাকে সে পছন্দও করে। কিন্তু টাকাপয়সা না থাকার জন্য সে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছে না।

অ্যান্টনিওর বাণিজ্য জাহাজগুলো তখন সাগরবক্ষে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরছে; এখনও সেগুলো বন্দরে ফেরেনি; তাই সে বন্ধুকে তখন অর্থসাহায্য করতে পারল না। সেজন্য সে বলল, 'অপেক্ষা করো বন্ধু। বর্তমানে আমার হাতে নগদ কিছু নেই সত্য, তবে তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করছি।'

কিন্তু তাহলে যে সর্বনাশ হবে। বাসানিও মুষড়ে পড়ে, 'জাহাজ বন্দরে পৌঁছেনি সে তো আমি জানি। কিন্তু টাকাটা যে এখনই দরকার। পোর্শিয়ার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার টাকা আমার তো কোনো উপকার করতে পারবে না বন্ধু।

অ্যান্টনিও বলল, 'তাহলে কোনো স্থান থেকে টাকাটা ধার নাও। আমি না হয় তোমার জামিন থাকব।'

কিন্তু অত টাকা ধার দেবে কে? অনেক ভেবে বাসানিও শাইলকের দ্বারস্থ হলো। বলল, 'ধনী বণিক অ্যান্টনিও যদি আমার জামিন থাকে তবে কি আপনি আমাকে তিন হাজার ড্যাকাট ধার দিতে প্রস্তুত আছেন? আমি সুদ দিতে প্রস্তুত।'

অ্যান্টনিওর কথায় সুদখোর শাইলক তামাটে দাঁত বের করে হাসলেন। এই মোক্ষম সুযোগ। প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্টনিওকে ফাঁদে ফেলার আশায় মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আর কুৎসা রটানোর প্রতিশোধ গ্রহণের এ সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করার যুক্তি সে খুঁজে পেল না।

একবাক্যে টাকা ধার দিতে সে রাজি হলো। মুখে মধুর বুলি আওড়ে বলল, অ্যান্টনিও যখন নিজেই জামিন থাকছে তখন আর সুদ গ্রহণের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তবে কিনা একান্ত পরিহাসছলে একটা শর্ত লিখে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অ্যান্টনিওর শরীর হতে শাইলককে এক পাউন্ড মাংস কেটে দিতে হবে।

সুদখোর বুড়ো শাইলকের কথায় বাসানিও চমকে উঠল। কিন্তু অ্যান্টনিও শুনে বলল, টাকাগুলো খুব দরকার। আর তা ছাড়া বাণিজ্য জাহাজ ফিরে এলে এ অর্থসংকট তো আর থাকছে না। তখন শাইলকের মনে কোনো বদ মতলব থেকে থাকলেও সে ব্যর্থ হবে, সে মাংস কেন অ্যান্টনিওর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

পোর্শিয়া প্রয়াত বাবার একমাত্র কন্যা। অসংখ্য ধনসম্পদ আর রূপলাবণ্যের জন্য বহু ডিউক ও রাজপুত্রদের নজরে পড়েছে সে। তার পাণিপ্রার্থী হয়ে তাই হাজার যুবকের ভিড়। কিন্তু বাবার নির্দেশমতো পোর্শিয়া মাত্র তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নিল। তার মধ্যে ভাগ্যবান বাসানিও ছিল।

বিয়ের শর্তানুযায়ী প্রাথমিক বাছাইকৃত যুবক তিনজনকে পৃথক পৃথকভাবে একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পাশাপাশি তিনটি পেটিকা ছিল। একটি সোনার আর একটি রুপার এবং সর্বশেষটি সিসার। একটা পেটিকার মধ্যে ছিল পোর্শিয়ার নিজের ছবি। ছবিসহ পেটিকা যে নির্বাচন করতে পারবে সে-ই বিজয়ী হবে এবং পোর্শিয়ার সাথে অগাধ ধনরত্নের উত্তরাধিকারী হবে। এই ব্যাপারটি বাবার উপদেশ অনুযায়ীই স্থির করেছিল পোর্শিয়া।

প্রথমে মরক্কোর রাজপুত্র ঘরের মধ্যে এলেন। পেটিকা তিনটির মধ্যে স্বর্ণেরটাই তিনি বাছাই করলেন। এর গায়ে কারুকার্যের সাথে খোদাই করা ছিল : যে আমাকে বাছাই করবে সে বহুগুণ বাঞ্ছিত ধন পাবে। কিন্তু খুলে দেখা গেল এতে পোর্শিয়ার ছবি নেই। পরিবর্তে আছে মড়ার মাথার খুলি আর উপদেশবাণী লেখা। একখানা চিরকুট। তাতে লেখা–

চকচক করিলেই সোনা নাহি হয়
বহু লোক এ কথাটি শুনেছে নিশ্চয়,
বহু লোক লোভে করে জীবনের ক্ষয়
শুধু দেখে বাহিরের চাকচিক্যের জয়।

মরক্কোর রাজকুমার মনে অফুরন্ত হতাশা আর হাহাকার নিয়ে বিদায় হলেন। এবার আরাগনের যুবরাজের পালা। তিনি রৌপ্য পেটিকা উত্তোলন করলেন। এই পেটিকার গায়ে খোদাই করা ছিল : আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার প্রাপ্য পাবে। কিন্তু বাক্সটি খুলে তিনি হতাশ হলেন। দেখলেন পোর্শিয়ার ছবির পরিবর্তে ভেতরে রয়েছে একটা বোকার ছবি আর একখানা চিরকুট। তাতে লেখা–

সাতবার রৌপ্য–পাত্র হয় অগ্নিদগ্ধ
বারবার পোড় খেলে বুদ্ধি পরিশুদ্ধ
আমি যথা ঢাকা ছিনু রূপোর মায়ায়
ফিরে যাও ঘরে তুমি, তোমাকে বিদায়।

যুবরাজ লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন। এবার বাসানিও। কম্পিত চোখে পেটিকা তিনটির গায়ের লেখা পড়লেন। দেখলেন, সিসার কৌটার গায়ে লেখা রয়েছে : আমাকে যে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসর্বস্ব ঝুঁকি নিতে হবে। অনেক চিন্তা করে এই সাধারণ জৌলুশহীন পেটিকাই নির্বাচন করলেন তিনি। কম্পিত হস্তে ঢাকনা খুলতেই যুবতী পোর্শিয়ার হাসিমাখা ছবি পেলেন এবং একখানা চিরকুট, তাতে লেখা–

করোনি বাছাই তারে দেখে চেকনাই
অনুকূল তব ভাগ্য সন্দেহ তো নাই
যবে হলো করায়ত্ত সৌভাগ্য তোমার
এতেই তুষ্ট থেকো, চেয়ো নাকো আর।

পোর্শিয়া তাকে স্বাগত জানাল। উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

এদিকে পোর্শিয়ার চাকরানি সুন্দরী নেরিসাকে দেখে বাসানিওর চাকর গ্রাসিয়ানো মুগ্ধ হয়ে গেল। পোর্শিয়ার মধ্যস্থতায় তারাও দাম্পত্যজীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

কিন্তু এত সুখের মধ্যেও একটি মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার খবর বয়ে আনল একখানা চিঠি। চিঠিখানা অ্যান্টনিও লিখেছে, তার সবগুলো জাহাজ ঝড়ে সাগরবক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। শাইলক টাকার জন্য আদালতে নালিশ করেছে। চিঠি বহনকারী সালারিও আরও জানাল, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইহুদি শয়তানটা টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কারণ দলিলের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন সে অ্যান্টনিওর গায়ের এক পাউন্ড মাংস চায়।

এর মধ্যে আরও এক ব্যাপার ঘটে গেছে। শাইলকের একমাত্র মেয়ে জেসিকা খ্রিষ্টান যুবক লরেঞ্জোর কুমন্ত্রণায় পড়ে পালিয়ে গেছে। লরেঞ্জো অ্যান্টনিওর বন্ধুপুত্র। তাই গোটা খ্রিষ্টান জাতির ওপর শাইলক এখন বীতশ্রদ্ধ। এখন আইনে যখন আটকানো গেছে তখন অ্যান্টনিওকে ক্ষমার আর কোনো প্রশ্নই উঠে না।

খবরটিতে পোর্শিয়া হায় হায় করে উঠল এবং স্বামীই যে এসবের মূল–তাও জানতে পারল। দশগুণ অর্থ দিয়ে বাসানিওকে তাড়াতাড়ি ভেনিসের আদালতে পাঠাল। সে সেখানে বিচার হবে মহামতি অ্যান্টনিওর।

স্বামীকে পাঠিয়ে বুদ্ধিমতী পোর্শিয়াও বসে থাকল না। পরিচারিকা নেরিসাকে সঙ্গে করে পুরুষের ছদ্মবেশে সেও ভেনিসের উদ্দেশে যাত্রা করল।

আদালতে তখন বিচার শুরু হয়ে গেছে। বিচারক অ্যান্টনিওকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোনো উকিল আছে? অ্যান্টনিও সংক্ষেপে জবাব দিল, না ধর্মাবতার, আমার কোনো উকিলের আবশ্যকতা নেই।

অবশেষে বিচারক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আপনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আপনাকে এমন একজন পাষাণ হৃদয় মানুষ নামধারী জঘন্যতম জীবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, যার মধ্যে মানবিক করুণার সামান্যতম ছিটেফোঁটাও নেই। তারপর শাইলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে অবশ্য তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

শাইলক ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'ধর্মাবতার, এখানে ক্ষমার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমি তো চুক্তিনামার বাস্তবায়ন চাচ্ছি মাত্র। আপনি যদি আমার প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তাহলে বুঝব আইনের অপমৃত্যু ঘটেছে।'

বিচারক আর কোনো কথা বললেন না। অ্যান্টনিও বলল, 'ধর্মাবতার, আপনি আর আমার জন্য অপদস্থ হবেন না। আমি প্রস্তুত।'

খুশিতে শাইলকের চোখ চকচক করে উঠল। তার প্রাপ্য এক পাউন্ড মাংস পাবার জন্য সে জুতোর তলায় ছুরি শান দিতে লাগল।

ঠিক এমন সময় এক পেয়াদা একখানা চিঠি এনে বিচারকের কাছে দিল। তাতে লেখা অ্যান্টনিওর এক বন্ধু একজন উকিল পাঠিয়েছেন। তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন; অ্যান্টনিওর পক্ষে কথা বলতে চান তিনি।

বিচারকের অনুমতি পেয়ে এক তরুণ উকিল আদালতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু উকিল সব শুনে মাংস কেটে

নেবার পক্ষেই সমর্থন দিলেন। শুনে বাসানিও স্থান কাল পাত্র ভুলে আদালতের মধ্যেই কাঁদতে শুরু করল। তার জন্যেই তো আজ তার অকৃত্রিম বন্ধু অ্যান্টনিওর এই অবস্থা।

উকিল বললেন, মানবতার খাতিরে আইনকে বিসর্জন দেওয়া আমাদের উচিত নয়। আমাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা আবশ্যক। এবার আপনি মাংস কেটে নিন। আর অ্যান্টনিও, আপনিও শর্ত পালনের জন্য প্রস্তুত হন।

অ্যান্টনিও আস্তে বললেন, আমি প্রস্তুত আছি।

শাইলক মহাখুশি। তরুণ উকিলের আইনের প্রতি বিচক্ষণতা, আনুগত্য ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করে ছুরি উঁচু করে অ্যান্টনিওর দিকে সে এগিয়ে গেল। তরুণ উকিল বলল, অবশ্যই, আপনাকে ধন্যবাদ শাইলক। আপনিও আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল জেনে সুখি হলাম। কারণ দশগুণ টাকা অ্যান্টনিও পরিশোধ করতে চাইলেও আপনি তা গ্রহণ করেননি।

'আপনি ঠিকই বলেছেন উকিল সাহেব।' দেঁতো হাসি হাসতে লাগল শাইলক।

অ্যান্টনিওর পক্ষের উকিল বললেন, শর্তানুযায়ী আপনি এক পাউন্ড মাংস পাবেন–অবশ্যই সেটা পাবেন, কিন্তু দেখবেন যেন মাংস কেটে নেবার সময় তার কম বা বেশি না হয়। দ্বিতীয়ত সঙ্গে একবিন্দু রক্তও যেন না ঝরে। কারণ রক্তের কথা দলিলে লেখা নেই।

বজ্রাহত পথিকের মতো দাঁড়িয়ে রইল শাইলক। এ তো সাংঘাতিক প্যাঁচ, রক্ত না ঝরলে মাংস নেবে কী করে। আর এক পাউন্ড মাংস মেপে কাটা কী সম্ভব?

শাইলক থরথর করে কাঁপছে আর তরুণ উকিলের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। উপায়ন্তর না দেখে শাইলক তাড়াতাড়ি বলল, আমি মাংস চাই না, আমার আসল টাকাটা চাই।

বিচারক এবার কথা বললেন, অসম্ভব। আপনার বিরুদ্ধে এবার চার্জ হবে। একজন নাগরিককে হত্যার উদ্দেশ্যে আপনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। এর শাস্তিস্বরূপ আপনার অর্ধেক সম্পত্তি অ্যান্টনিও পাবে–বাকি অর্ধেক সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

অ্যান্টনিও চমকে উঠল। বলল, না, ওর একটা কানাকড়িও আমি চাই না। আমার বন্ধুপুত্র লরেঞ্জো ওর মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ও যদি স্বীকৃতি দেয় তবে তাদেরকে আমার অংশ আমি দান করে দিলাম।

অগত্যা শাইলক তাতেই রাজি হলো।

বিচারকার্য শেষ হলো। অ্যান্টনিও তরুণ উকিলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। পারিশ্রমিকের কথা উঠলে তিনি বললেন কোনো পারিশ্রমিক তিনি নেবেন না, তবে যদি একান্তই তিনি দিতে চান তবে তার বন্ধু বাসানিওর আংটিটা উপহারস্বরূপ দিতে পারেন।

আংটিটা আর এমন কী মূল্যবান! তবু বাসানিও তা দিতে ইতস্তত করছিল। কারণ আংটিটা ছিল নববধূ

পোর্শিয়ার তরফের উপহার এবং এটা হস্তান্তর নিষিদ্ধ ছিল। তবু বন্ধুর ব্যাপারে সে কি না দিতে পারে!

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। বাসানিও ফিরে এলেন বেলমেন্ট শহরে পোর্শিয়ার কাছে। বাসানিওর হাতে আংটি না দেখে বিস্মিত হয়ে বাসানিওকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার হাতে আমার দেওয়া উপহারটা কই?

বাসানিও সব খুলে বলল। তারপর হাসিমুখে পোর্শিয়া একটা আংটি এনে তার হাতে পরিয়ে দিল। কিন্তু আংটিটা দেখে চমকাবার পালা ছিল অ্যান্টনিওর। কারণ এ সেই আংটি যেটা সে তরুণ উকিলকে উপহার দিয়ে এসেছিল। সে জানতে চাইল, 'তুমি এটা কোথায় পেলে?'

তখন একটা উচ্চহাসির রোল পড়ে গেল।

সার–সংক্ষেপ

ইতালির ভেনিস শহরের সওদাগর অ্যান্টনিও। সকলের কাছে সে প্রশংসিত। আর এক ব্যবসায়ী শাইলক– নীতিহীন, সুদখোর, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। কেউ তাকে পছন্দ করে না। সে অ্যান্টনিওর ধ্বংস কামনা করত। অ্যান্টনিও তাই সংগতকারণেই তাকে দেখতে পারত না। অ্যান্টনিওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাসানিও। টাকা–পয়সার অভাবে সে পোর্শিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছে না। অবশেষে অ্যান্টনিওর প্রতিশ্রুতিমতো বাসানিও শাইলকের কাছে গেলেন। এদিকে পোর্শিয়াকে অনেকেই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তার বাবার নির্দেশমতো সে তিন প্রতিদ্বন্দ্বী যুবককে বেছে নেয়। যুবকদের পৃথক পৃথকভাবে এক সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি সোনার, একটি রূপার এবং একটি সিসার পেটিকা ছিল। এর একটি পেটিকার মধ্যে ছিল পোর্শিয়ার ছবি। শর্ত হচ্ছে, ছবিসহ পেটিকা যে নির্বাচন করতে পারবে তাকেই পোর্শিয়া বিয়ে করবে। একে একে মরক্কো ও আরাগনের রাজপুত্র শর্ত মোতাবেক সঠিক পেটিকা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন। সবশেষে বাসানিও সফল হওয়ায় পোর্শিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়।

এদিকে শাইলকের কাছ থেকে ধার নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় শাইলক এখন টাকার বদলে অ্যান্টনিওর গায়ের এক পাউন্ড মাংস চাইছে। খবরটা পোর্শিয়াকে বিচলিত করে। আদালতে কাঠগড়ায় যখন অ্যান্টনিওর বিচরকার্য চলছে,তখন এক তরুণ উকিলের ছদ্মবেশে পোর্শিয়া বিচারকের সামনে এসে দাঁড়ায়। তরুণ উকিল শাইলককে অ্যান্টনিওর শরীর থেকে রক্তপাতহীন এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে বলে। কিন্তু রক্ত না ঝরিয়ে মাংস কাটা যে সম্ভব নয়। ধূর্ত শাইলক খুব বিপদে পড়ে যায় এবং অবশেষে বিচারে সে হারে।

শব্দার্থ

মার্চেন্ট অব ভেনিস (THE MERCHANT OF VENICE) – ভেনিস শহরের বণিক বা সওদাগর। ভেনিস ইটালির একটি বড় শহর।

প্রতিপত্তি – ক্ষমতা, শক্তি।

সর্বস্ব – যা কিছু আছে সমস্তই।

বরদাস্ত – সহ্য।

সুদখোর – টাকা ধার দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী।

মোক্ষম – প্রবল, সাংঘাতিক।

কুৎসা – নিন্দা।

মতলব – ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।

কেশাগ্র – চুলের ডগা (অগ্রভাগ)।

প্রয়াত – গত।

ড্যাকাট – ইতালীয় মুদ্রা।

পাণিপ্রার্থী – বিয়ে করতে ইচ্ছুক।

চাকচিক্য – ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি।

বীতশ্রদ্ধ - শ্রদ্ধাহীন, আস্থাহীন।

অপদস্থ – লাঞ্ছিত, অসম্মানিত।

আনুগত্য – বশ্যতা, অধীনতা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "মার্চেন্ট অব ভেসিন' এর অর্থ ভেনিসের–

ক. ভেনিসের রাজপুত্র খ. ভেনিসের সওদাগর

গ. ভেনিসের প্রেমিক ঘ. ভেনিসের নাবিক

২. শাইলক ছিল–

ক. ধর্মবিদ্বেষী খ. বর্ণবিদ্বেষী

গ. মানববিদ্বেষী ঘ. জাতিবিদ্বেষী

৩. অ্যান্টনিও-এর পক্ষের ছদ্মবেশী তরুণ উকিল ছিলেন প্রকৃতপক্ষে–

ক. পোর্শিয়া খ. লরেঞ্জো

গ. ম্যালারিও ঘ. নেরিসা

৪. নিচের অংশটুকু পড় এবং ৫ থেকে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অ্যান্টনিওর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার এ সুবর্ণ সুযোগ শাইলক উপেক্ষা করতে চাইল না। একবাক্যে সে বাসানিওকে টাকা ধার দিতে রাজি হয়ে গেল। মধুর কণ্ঠে বলল, অ্যান্টনিও যখন নিজেই জামিন থাকছেন তখন সুদের প্রশ্ন উঠে না। তবে কিনা একান্ত পরিহাসছলে একটা শর্ত লিখে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ধার পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামিনদারের শরীর থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে দিতে হবে।

৫. বাসানিও এর ঋণের জামিনদার কে?

ক. লরেঞ্জো খ. পোর্শিয়া

গ. নেরিসা ঘ. অ্যান্টনিও

৬. শাইলক এর চুক্তির শর্তে প্রকাশ পেয়েছে শাইলকের—

i. প্রতিহিংসাপরায়ণতা

ii. বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব

iii. কুচক্রী দৃষ্টিভঙ্গি

নিচের কেনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৭. বাসানিওকে টাকা ধার দেওয়ার পেছনে শাইলকের মূল উদ্দেশ্য—

i. অ্যান্টনিওকে হেয় প্রতিপন্ন করা

ii. অ্যান্টনিও এবং বাসানিওর সম্পর্কে ফাটল ধরানো

iii. তার জিঘাংসা চরিতার্থ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও ii

গ. ii ঘ. i, ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. জমি আবাদের জন্য সরলপ্রাণ ইসমাইল তার গ্রামের মোড়লের কাছ থেকে একটি জমি বন্ধক রেখে ১০ হাজার টাকা ধার নেয়। ধার নেয়ার সময় মোড়ল সাদা স্ট্যাম্পে ইসমাইলের স্বাক্ষর রাখে। দুই বছর পর ইসমাইল মোড়লকে ঐ টাকা ফেরত দিতে গেলে সে টাকা গ্রহণ না করে বলে, 'তুমি তে ঐ জমিটা আমার নিকট ৫০,০০০/– (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় বিক্রি করেছ'। নিরূপায় ইসমাইল আইনের আশ্রয় নেয়।

ক. ইসমাইল মোড়লের নিকট হতে কোন শর্তে টাকা ধার নেয়?

খ. ইসমাইলের সরলতাকে মোড়ল কীভাবে ব্যবহার করেছে–বর্ণনা কর।

গ. তোমার পঠিত 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' গল্পের শাইলক–চরিত্রের সঙ্গে উদ্দীপকের মোড়ল-চরিত্রের কী মিল লক্ষ করা যায়– বর্ণনা কর।

ঘ. কুচক্রী এ সকল মোড়ল একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের যে ক্ষতি সাধন করছে উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।

২. সোনাপুর গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী ইমরান সাহেবের কাছে দরিদ্র জালাল মিয়া কন্যার বিবাহের জন্য কিছু সাহায্য চাইলে তিনি তাকে ৫০০০ টাকা দিলেন। প্রচণ্ড খরায় দিশেহারা কয়েকজন কৃষক তার কাছে কিছু লোন চাইলে বিনা শর্তে তাদেরকে ২০০০ টাকা করে লোন দিলেন এবং সুবিধাজনক সময়ে ফেরত দিতে বললেন।

ক. ইহুদি ব্যবসায়ীর নাম কী?

খ. এই ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের ধরন বর্ণনা কর।

গ. 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' গল্পের অ্যান্টনিও চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ইমরান সাহেবের মধ্যে লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ইমরান সাহেব যেন অ্যান্টনিওর প্রতিচ্ছবি' মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

রিপভ্যান উইংকল

ফখরুজ্জামান চৌধুরী

[ওয়াশিংটন আরভিং রচিত 'রিপভ্যান উইংকল' অবলম্বনে]

হাডসন নদীর উপর দিয়ে জাহাজে করে যারা গেছে তাদের সবারই দৃষ্টি কেড়েছে ক্যাট্সকিল পাহাড়গুলো। নদীর পশ্চিম দিকে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে এ পাহাড়শ্রেণি।

এসব রূপকথার পাহাড়ের নিচে আছে এক গ্রাম। অনেক বছর আগে সে গ্রামে বাস করত একজন লোক; নাম তার রিপভ্যান। উইংকল পরিবারের সদস্য বলে রিপভ্যান উইংকল নামেই সবার কাছে ছিল তার পরিচয়।

গ্রামের সবাই তাকে খুব ভালোবাসত। ছেলেরা তাকে পথে দেখলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠত। খেলাধুলার ব্যাপারে ছেলেদের সে খুব সাহায্য করত, তাদের খেলার জিনিস বানিয়ে দিত, ঘুড়ি ওড়ানো শেখাত, মার্বেল খেলা শেখাত।

রিপের এই আড্ডাবাজ মনোভাব গ্রামের অলস বন্ধুরা মেনে নিলেও তার স্ত্রী কিন্তু মেনে নিল না। নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না রিপ। দোষের মধ্যে শুধু সে কখনো বিশেষ কাজ করত না। পরিশ্রম বা অধ্যবসায়ের ভয়ে কিন্তু সে অমন করত না। কারণ প্রায়ই সে এক টুকরো ভিজে পাথরের উপর বসে থাকত। হাতে থাকত ইয়া বড় এক লাঠি। শান্তশিষ্টভাবে বসে বসে সে মাছ ধরত। কিন্তু ভুলেও কোনো মাছ তার বড়শিতে ধরা পড়ত না। সে একটা ফাঁদ কাঁধে করে উঁচু পাহাড় আর বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত কাঠবিড়ালি আর বুনো কবুতর ধরার জন্য। পাড়াপড়শির সবচেয়ে কঠিন কাজটাও সে করে দিত। ঢেঁকিতে ধান ভানতে অথবা পাথরের প্রাচীর গড়তেও সে তাদের সাহায্য করত। এককথায় রিপভ্যান উইংকল অন্যের উপকার করে দেওয়ার জন্য সবসময় রাজি থাকত।

রিপভ্যান উইংকলের ছেলেগুলো খুব বজ্জাত হয়ে উঠল। বাপের ছন্নছাড়া ভাব তাদেরকে আরও অলস হবার জন্য সাহসী করে তুলল। রিপভ্যানের তবু জ্ঞান হলো না। নিজেও সরল জীবনযাপন কামনা করে। পরিশ্রম করে টাকা রোজগারের চেয়ে উপোস থাকাই যেন শ্রেয়।

রিপভ্যান উইংকল হেসে-খেলে জীবন কাটালেও তার স্ত্রী সবসময় আলসেমি আর অসাবধানতার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করত। পরিবারটাকে সে ধ্বংস করছে বলেও তাকে সে গাল দিত। রিপ শুধু কাঁধ দুলিয়ে, মাথা উঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে কোনো কথা না বলে তার জবাব দেয়। আর মাঝে মাঝে সে বাড়ির বাইরে চলে গিয়ে ঝগড়া লাগা বন্ধ করে।

রিপের একমাত্র পোষা প্রাণী ছিল তার কুকুর উল্‌ফ্। কুকুরটাও তার মনিবের মতোই রিপের স্ত্রীর কাছে অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা লাভ করত। স্ত্রী মনে করত, কুকুরটাই তার মনিবকে বেয়াড়া করে তুলেছে। কারণ কুকুরটাই ছিল রিপের একমাত্র ভ্রমণসঙ্গী। আর কুকুরটা যেন ভাবত, 'বেচারা রিপ কর্ত্রী তোর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে? আমি বেঁচে থাকতে তোর বন্ধুর অভাব হবে না।' উল্‌ফ্ হয়তো সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনিবের দুঃখ বোঝার চেষ্টা করত।

শরৎকালের একদিন। রিপ ক্যাট্স্কিল পাহাড়ের একটা অংশে বসে ছিল। বসে বসে সে কাঠবিড়ালি শিকার করছিল। বন্দুকের শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ক্লান্ত হয়ে একসময় সে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। রিপ দেখল, নিচে তরতর করে বয়ে চলেছে হাডসন নদী। নদীর বুকে পড়েছে বেগুনি রঙের ছায়া।

রিপ উঠে নিচে নামতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। চারদিকে তাকিয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। ভাবল, তার শোনার ভুল হতে পারে। কিন্তু আবারও শুনতে পেল সেই ডাক, 'রিপভ্যান উইংকল'।

কুকুরটা ভয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল। রিপের একটু ভয় হলো। সে তাকিয়ে দেখল, অদ্ভুত একটা লোক পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। লোকটাকে রিপ চিনতে পারল না। হতে পারে কোনো সাহায্যপ্রার্থী, তাই রিপ এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। লোকটা সত্যি অদ্ভুত আকৃতির। মাথায় একঝাঁক ভারী চুল, মুখে কচকে দাড়ি। আর পোশাক পুরোনো ওলন্দাজ ধাঁচের। কাপড়ের জামায় তার বুক ঢাকা। পরনে ব্রিচেস। ঢিলেঢালা ব্রিচেসের গায়ে বোতাম লাগানো, আর হাঁটুর দিকটা বেশ উঁচু। কাঁধে তার মদ ভরা একটা ভান্ড। সে রিপকে কাছে এসে বোঝা নিয়ে সাহায্য করতে ইশারা করল।

বোঝা ভাগাভাগি করে তারা পাহাড় বেয়ে নেমে এল। রিপ শুনতে পেল পাহাড়ের মাঝে যেন বাজ ডাকছে। থমকে দাঁড়াল সে। কিন্তু সাহসে ভর করে আবার লোকটাকে অনুসরণ করল। ওরা কিছুক্ষণ পর উন্মুক্ত একটা খাদে এসে পৌঁছাল। উপরে গাছের ডালের ফাঁকে আকাশ আর মেঘ দেখা যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত রিপ আর তার সঙ্গী কোনো কথা না বলে পথ হাঁটছিল। লোকটা সম্বন্ধে রিপ নানা কথা ভাবতে লাগল।

উন্মুক্ত খাদে রিপ আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখল। জায়গাটার মাঝখানে বসে কতগুলো অদ্ভুত লোক কী যেন খেলছে। তাদের পোশাকও অদ্ভুত গোছের। তাদের কেউ পরেছে ছোট্ট পাজামা, আবার কেউ পরেছে জামা।

তাদের বেল্টের সাথে ছুরি ঝোলানো। এদের প্রত্যেকে রিপের সাথির মতো ব্রিচেস পরেছে। তাদের মুখও অদ্ভুত রকমের। কারও মাথা বড়, কারও মুখ বড়, আর শুয়োরের মতো ছোট ছোট চোখ। আবার কারও মুখ যেন নাকের সমান। মাথায় সাদা পাউরুটির মতো হ্যাট, হ্যাটে মোরগের ছোট্ট লাল পালক বসানো। এদের রয়েছে ভিন্ন আকার আর রঙের দাড়ি।

এদের মধ্যে যে সর্দার তাকে দেখলেই চেনা যায়। সে একজন বুড়ো মানুষ। রিপ দেখে অবাক হলো, লোকগুলো আমোদপ্রিয় হলেও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে বসে আছে। ওদের দেখে তারা পুতুলের মতো তাকিয়ে রইল।

রিপ কেমন যেন ভড়কে গেল। তার সঙ্গী এবার ভাণ্ডের মদ একটা পাত্রে ঢেলে ওকে বসতে বলল। ভয়ে ভয়ে আদেশ পালন করল রিপ। লোকগুলো নীরবে মদ পান করে খেলতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে রিপের ভীতিভাব কেটে গেল। কেউ আর তার দিকে তাকিয়ে নেই দেখে সে সাহস করে মদ্য পানের কথা ভাবল। অনেকক্ষণ ধরে বেচারার তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঢক্ ঢক্ করে সে মদ পান করতে লাগল, আর ধীরে ধীরে তার মাথা ভারী হয়ে এল, চোখ বন্ধ হয়ে এল। অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে জেগে রিপ দেখল সে সবুজ উপত্যকায় শুয়ে আছে। এখানেই লোকটার সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। চোখ রগড়ে সে দেখল, সকাল হয়েছে। বনে বনে পাখি ডাকছে। ভোরের বাতাস বইছে। কিন্তু সেই লোকগুলো আর নেই।

স্ত্রীর কথা মনে পড়ে ভীত হলো রিপ। বাইরে রাত কাটাবার কৈফিয়ত স্ত্রীকে সে কেমন করে দেবে। 'ওহ বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা'– মনে মনে উচ্চারণ করল রিপ।

তার বন্দুকের খোঁজ করল সে। কিন্তু তার তেল–চকচকে পরিষ্কার বন্দুকটার পরিবর্তে সে দেখতে পেল ময়লা একটা বন্দুক পড়ে আছে। বন্দুকটার নলে মরচে ধরেছে, আর তার বাঁট পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এবার তার সন্দেহ হলো, পাহাড়ের ভূতগুলো তার সাথে এই চালাকি করেছে। তাকে মদ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তার বন্দুকটা তারা চুরি করেছে। উল্‌ফ্‌কেও ধারে–কাছে কোথাও দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি এ ভুতুড়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল রিপ। কিন্তু যাবার কোনো পথ পেল না। পাথরগুলো দেয়ালের মতোই পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বেচারা রিপ শিস দিয়ে কুকুরটাকে ডাকল। তার ডাকের জবাব দিল মরা গাছে বসে থাকা কিছু কাক 'কা–কা' করে।

অবশেষে মরচে–ধরা বন্দুকটা সম্বল করেই পথ খুঁজতে লাগল রিপ। বহু কষ্টে সে বেরিয়ে এল। তাকে যে করেই হোক বাড়িতে ফিরতেই হবে।

গ্রামের কাছে আসতে একদল লোকের সঙ্গে তার দেখা। আশ্চর্য, তাদের কাউকে সে চেনে না। অথচ গ্রামের সবাই তার কতই না পরিচিত। এদের কাপড়চোপড়ও একটু নতুন ধরনের। এ ধরনের পোশাকের সাথে তার পরিচয় নেই। লোকগুলো তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর তাদের চিবুকে হাত বুলাচ্ছে। ওদের দেখাদেখি রিপও তাই করল, আর তখনই সে বুঝতে পারল তার চিবুকে ঝুলছে কয়েক ফুট লম্বা দাড়ি।

এবার গ্রামে ঢুকল সে। একদল ছেলেমেয়ে তার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল। কুকুরগুলো তার কাছ দিয়ে যাবার সময় ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল, যেন আজব এক চিড়িয়া দেখতে পেয়েছে তারা।

রিপ অনুভব করল রাতারাতি গ্রামের পরিবেশ বদলে গেছে। নতুন ধাঁচের সব বাড়িঘর, লোকজনের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেশি! কিন্তু তা কী করে সম্ভব হলো। দূরের পাহাড়, হাডসন নদী সবই তো ঠিক আছে, পথ ভুলে অন্য গ্রামে ঢুকে পড়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। গত রাতের মদের পাত্রটা তার এই অবস্থা করে ছেড়েছে।

অতিকষ্টে পথ চিনে সে নিজের ঘরের দিকে যেতে লাগল। কিন্তু সে দেখল—তার বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, ছাদ ভেঙে পড়েছে, জানালা–দরজা সব ভেঙে একাকার। অর্ধ–অনাহারী একটা কুকুর বাড়ির আশেপাশে ঘুরছে। তাকে দেখতে অনেকটা উল্‌ফের মতোই মনে হয়। রিপ তার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু কুকুরটা দাঁত খিঁচিয়ে চলে গেল।

ঘরের ভিতরে ঢুকল রিপ। স্ত্রী ডেম ভ্যান উইংকল আর তার ছেলেদের খোঁজ করল। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে সত্যিই তার ভয় হলো।

এবার সে দৌড়ে তার পুরোনো আড্ডাখানা সরাইখানায় গেল। কিন্তু তারও কোনো পাত্তা নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একখানা কাঠের ঘর। ঘরটার দরজায় লেখা, 'দি ইউনিয়ন হোটেল'। মালিক : জোনাথন ডুলিটল।

লম্বা দাড়ি, মরচে–ধরা বন্দুক আর একপাল ছেলেপিলেসহ রিপের দিকে হোটেলের সবারই দৃষ্টি পড়ল। তারা রিপের চারদিকে ঘিরে ধরল। তারা সবাই রাজনীতি নিয়ে নানা প্রশ্ন করল রিপকে। কিন্তু সেসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না।

রিপের কানের কাছে একজন মুখ এনে জিজ্ঞেস করল, রিপ ফেডারেল, না গণতন্ত্রী। এবারেও রিপের বোকা হবার পালা। একজন বিশিষ্ট এবং সবজান্তা লোক ভিড় ঠেলে রিপের কাছে এগিয়ে এল। মাথায় তার টুপি আর হাতে ছড়ি। সে এসে হুঙ্কার ছাড়ল কেন রিপ ভোটের সময় বন্দুক কাঁধে দলবল নিয়ে এসেছে এবং কেন সে দাঙ্গা বাধাতে চায়?

এবার লোকজন চিৎকার করে উঠল, 'এই লোকটা গুপ্তচর। উদ্বাস্তু। তাকে মার লাগাও।'

বিশিষ্ট লোকটি অতিকষ্টে শান্তি রক্ষা করল। অচেনা অপরাধীর পরিচয় জানতে চাইল। বেচারা রিপ সবিনয়ে বলল যে, তাদের কোনো ক্ষতি করবে না সে। সে এসেছিল তার প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিতে।

'ঠিক আছে তাদের নাম বলো।'

রিপ একটু থেমে বলল, 'নিকোলাস ডেভার কোথায়?'

কতক্ষণ সবাই চুপ থাকার পর এক অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি সরু গলায় জবাব দিল, 'সে তো আঠারো বছর আগে মারা গেছে।'

'ব্রম ডুচার কোথায়?'

'সে তো যুদ্ধ শুরু হতেই সৈন্যদলে যোগ দিয়ে চলে গেছে এবং মারাও গেছে বলে আমরা জেনেছি।'

'স্কুল মাস্টার ভ্যান বুশেল কোথায়?'

' সেও যুদ্ধে গিয়েছিল। সেখানে সে বড় পদও পায়। এখন সে একজন কংগ্রেসি।'

বন্ধুদের এরকম পরিবর্তন ও পৃথিবীতে তাকে একা দেখে রিপের হৃদয় দমে গেল। প্রতিটা উত্তর আর দৃশ্যই তাকে হতভম্ব করতে লাগল। এমতাবস্থায় হ্যাট–পরা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি কে?'

'খোদা জানেন', রিপ কেঁদে উঠল, 'আমি আর আমি নেই। আমি অন্য কেউ। তা না হলে এক রাতের ব্যবধানে কী এত পরিবর্তন আসে? আমি পাহাড়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পাহাড়িরা আমার বন্দুক বদলে দিয়েছে।'

উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ মাথা ঝাঁকাতে লাগল। একজন ছোঁ মেরে বন্দুকটা কেড়ে নিল। ছড়ি আর টুপিওয়ালা লোকটা গোলমাল আন্দাজ করে দ্রুত সরে পড়ল।

ঠিক তখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ফিটফাট একজন মহিলা। ছাইরঙের বৃদ্ধ লোকটাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার কোলে একটি শিশু। শিশুটা ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করলে মহিলাটি বলল, 'এই রিপ থাম্, ও তোকে কিছু করবে না।' শিশুটির নাম ও তার মায়ের কণ্ঠস্বর রিপের মনে পুরাতন স্মৃতি জাগিয়ে দিল। 'তোমার নাম কী গো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জুনিথ গার্ডনার'।

'বাপের নাম?'

'আহা, তাঁর নাম ছিল রিপভ্যান উইংকল। কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে সেই যে তিনি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন আর ফেরেননি। তার কুকুরটা একা একা ফিরে এসেছে। তিনি কি বন্দুক নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, না ইন্ডিয়ানরা তাঁকে মেরে ফেলেছেন, কেউ তা বলতে পারে না। তখন আমি এতটুকুন ছিলাম।'

রিপের তখন আর একটা কথা জিজ্ঞেস করা বাকি।

'তোমার মা কোথায়?'

'আহা, তিনিও কদিন আগে মারা গেছেন।'

এবার রিপ আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মেয়ে আর নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার বাবা। একসময়ের যুবক রিপভ্যান উইংকল আজ হাড্ডিসার বুড়ো।'

সবাই তো একদম অবাক। ভিড় ঠেলে এক বুড়ি এসে ভুরুর উপর হাত রেখে বলল, 'সত্যি! রিপভ্যান উইংকলই বটে। বুড়ো প্রতিবেশী, এসো এসো, বিশ বছর কোথায় ছিলে?'

রিপ তার কাহিনী বলল। দীর্ঘ বিশ বছর তার কাছে এক রাত্রি মোটে! এমন তাজ্জব কথা কে শুনেছে কবে।

পিটার হলো এখানকার পুরোনো অধিবাসী এবং এখানকার লোকদের সম্বন্ধে তার পুরো জ্ঞান। সে রিপের কথাগুলো বিশ্বাস করল; সে আরও বলল যে, তার বংশের ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, ক্যাট্সকিল পাহাড়ে অদ্ভুত ধরনের লোক সত্যি আছে। তারা নাকি উন্মুক্ত খাদে খেলা করে বেড়ায় এবং পাহাড়ের মধ্যে বাজের মতো শব্দও শোনা যায়।

রিপভ্যান উইংকল আর কিছুই নয়–সেই ঐতিহাসিকদের কথা প্রমাণ করে এল মাত্র।

সার–সংক্ষেপ

যারা রহস্যগল্প পড়তে পছন্দ করে তাদের কাছে যুগ যুগ ধরে রিপভ্যান উইংকল–এর গল্প সমাদৃত হয়েছে। যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন লেখা যারা পড়তে চায় না, তাদের কাছেও, বিশেষ করে তরুণদের কাছে রিপভ্যান ব্যাপক প্রশংসিত গল্প।

রিপভ্যান ছিল একজন অলস প্রকৃতির লোক। বাস করত হাডসন নদীর তীরে ক্যাট্সকিল পাহাড়ের পাদদেশে ছোট একটি গ্রামে। গ্রামের সবাই তাকে খুব ভালোবাসত। তবে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেই সে পছন্দ করত। বনে বনে সে কাঠবিড়ালি আর কবুতর ধরার জন্য একটা ফাঁদ কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এজন্য তাকে প্রায়ই তার স্ত্রীর চোখরাঙানি সহ্য করতে হতো । একদিন স্ত্রীর বকুনি থেকে বাঁচার জন্য সে তার পোষা কুকুর উল্ফ্ আর বন্দুকটা নিয়ে চলে গেল ক্যাট্সকিল পাহাড়ের একপ্রান্তে। সেখানে সে একদল অচেনা অদ্ভুত লোকের দেখা পায়। তাদের পরিবেশিত মদ পান করে রিপভ্যান ঘুমিয়ে পড়ে। সেই ঘুম ভাঙে তার বিশ বছর পর। যদিও রিপের কাছে তা মনে হয়েছিল মাত্র একটা রাত্রি। এত বছর পর রিপ তার গ্রামে ফিরে এসে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করে। গ্রামের বুড়োরা ছাড়া তরুণদের কেউই তাকে চিনতে পারে না।

এইসব মজার ঘটানা নিয়ে রিপভ্যান উইংকেল–এর গল্প।

শব্দার্থ

সগৌরবে – গৌরবের সাথে।

আড্ডাবাজ – আড্ডা দিতে পটু।

বজ্জাত – দুষ্ট।

অবজ্ঞা – উপেক্ষা, ঘৃণা।

বেয়াড়া – একরোখা, খারাপ।

ওলন্দাজ – হল্যান্ড দেশের অধিবাসী।

উন্মুক্ত – খোলা।

কৈফিয়ত – জবাবদিহি।

উপত্যকা – দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতলভূমি।

অনাহারী – উপবাসী।

হতভম্ব – স্তম্ভিত, ভ্যাবাচ্যাকা।

ঐতিহাসিক – ইতিহাস লেখক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

রিপের অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু তার মনে হলো মাত্র এক রাত। বন্ধুদের পরিবর্তন আর তার একাকিত্বে রিপের হৃদয় দমে গেল। লোকজনের ভিড় ঠেলে একজন মহিলা এগিয়ে এল। তার কোলে একটি শিশু। শিশুটা ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। শিশুটির নাম ও তার মায়ের কণ্ঠস্বর রিপের মনে পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে দিল। 'তোমার নাম কী গো?'–জুনিথ গার্ডনার জিজ্ঞাসা করল।

১. জুনিথ গার্ডনার কে?

ক. রিপভ্যানের স্ত্রী খ. ব্রমভুচারের মেয়ে

গ. রিপভ্যানের নাতনি ঘ. রিপভ্যানের মেয়ে

২. শিশুটি ভয় পেল কেন?

ক. অচেনা বৃদ্ধকে দেখে খ. বন্দুক দেখে

গ. লাঠি দেখে ঘ. ছড়ি দেখে

৩. মহিলার কণ্ঠস্বর শুনে রিপের কোন স্মৃতি জেগে উঠল?

ক. বহুদিনের কথা খ. স্ত্রী–কন্যার স্মৃতি

গ. বন্ধুদের কথা ঘ. শিশুপুত্রের কথা

৪. কত বছরকে রিপের এক রাত মনে হলো?

ক. ত্রিশ বছর খ. পঁচিশ বছর

গ. বিশ বছর ঘ. পনের বছর

৫. 'অক্ষম' শব্দে 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটি কোন কোন বর্ণের সংযোগে হয়েছে?

ক. ক+ক খ. খ+খ

গ. ক+ষ ঘ. ক+খ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিপের এই আড্ডাবাজ মনোভাব গ্রামের অলস বন্ধুরা মেনে নিলেও তার স্ত্রী কিন্তু মেনে নিল না। নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না রিপ। দোষের মধ্যে শুধু সে কখনো বিশেষ কোনো কাজ করত না। পরিশ্রম বা অধ্যবসায়ের ভয়ে কিন্তু সে অমন করত না। কারণ প্রায়ই সে এক টুকরো ভিজে পাথরের ওপর বসে থাকত। হাতে থাকত ইয়া বড় এক লাঠি। শান্তশিষ্টভাবে বসে বসে সে মাছ ধরত। কিন্তু ভুলেও কোনো মাছ তার বড়শিতে ধরা পড়ত না। সে একটা ফাঁদ কাঁধে করে উঁচু পাহাড় আর বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত কাঠবেড়ালি আর বুনো কবুতর ধরার জন্য। পাড়াপড়শির সবচেয়ে কঠিন কাজটাও সে করে দিত। ঢেঁকিতে ধান ভানতে অথবা পাথরের প্রাচীর গড়তেও সে তাদের সাহায্য করত। এককথায় রিপভ্যান উইংকল অন্যের উপকার করে দেওয়ার জন্য সবসময় রাজি থাকত।

ক. রিপভ্যান উইংকল কোথায় বাস করত?

খ. গ্রামের লোকেরা রিপভ্যানকে কেন ভালোবাসত?

গ. উদ্ধৃতাংশ অবলম্বনে রিপভ্যান উইংকেল–এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার মতামত উল্লেখ কর।

ঘ. 'দোষের মধ্যে শুধু সে কখনো বিশেষ কাজ করত না'– কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কুকুরটা ভয়ে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল। রিপের একটু ভয় হলো। সে তাকিয়ে দেখল, অদ্ভুত একটা লোক পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। লোকটাকে রিপ চিনতে পারল না। হতে পারে কোনো সাহায্যপ্রার্থী, তাই রিপ এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। লোকটা সত্যি অদ্ভুত আকৃতির। মাথায় একঝাঁক ভারী চুল, মুখে চকচকে দাড়ি। তার পোশাক পুরোনো ওলন্দাজ ধাঁচের। কাপড়ের জামায় তার বুক ঢাকা। পরনে ব্রিচেস।.... কাঁধে তার মদ–ভরা একটা ভাণ্ড। সে রিপকে কাছে এসে বোঝা নিয়ে সাহায্য করতে ইশারা করল।

ক. রিপভ্যানের পোষা কুকুরের নাম কী?

খ. কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল কেন?

গ. রিপভ্যান উইংকেল–এর পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখ।

ঘ. 'লোকটা সত্যি অদ্ভুত আকৃতির।'– লোকটা কে? এবং কেন তাকে অদ্ভুত প্রকৃতির বলা হয়েছে আলোচনা কর।

সাড়ে তিন হাত জমি

মূল: লেব তলস্তয়

রূপান্তর : প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

বড় বোন ব্যবসায়ীর স্ত্রী, থাকে শহরে। ছোট বোন কৃষকের স্ত্রী, থাকে গ্রামে। বড় বোন এসেছে ছোট বোনের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে। চা খেতে খেতে দুই বোন গল্প করছিল। বড় বোন বলছিল শহরে থাকার সুযোগ–সুবিধার কথা। বেশ বাড়িয়ে বলা। যাকে বলে গল্প দেওয়া। ছোট বোনও গ্রামে থাকার ভালো দিকগুলোর কথা বলে।

ছোট বোনের স্বামী পাখোম সব শুনছিল। সে বলল, 'কথা ঠিক। ছোটবেলা থেকেই মাটির কোলে পড়ে আছি। তাই বলে তেমন কোনো অভাব নেই। অভাব কেবল একটিই, আমার জমি খুব কম। জমি যদি পাই তা হলে কাউকে পরোয়া করব না, স্বয়ং শয়তানকেও না।'

শয়তান শুনে বেশ খুশি হলো। ভাবল, একে নিয়ে মজার একটা খেলা খেলবে। আগে অনেক জমি দেবে, তারপর কেড়ে নেবে।

পাখোমের জমি ক্রয়

পাখোমের বাড়ির কাছে একজন মহিলা বাস করতেন। তিনি ছিলেন ২৪০ একর জমির মালিক। ভালো মানুষ তিনি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার সম্পর্কও ভালো। অবসরপ্রাপ্ত একজন সৈনিককে জমিদারির ওভারশিয়ার নিযুক্ত করলেন তিনি। ওভারশিয়ার লোকটি ভালো নয়। নানা ছলছুতায় কৃষকদের জরিমানা করে সে। কারও গরু, ঘোড়া, বাছুর জমিজিরাতে ঢুকলেই সে জরিমানা করে, অত্যাচার করে। এরই মধ্যে শোনা গেল জমিদার মহিলা তার সব জমি বিক্রি করে দেবেন। আর ওভারশিয়ার কিনে নেবে তার সম্পত্তি। কৃষকরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে। শেষে সবাই মিলে বেশি দামে জমি কেনার প্রস্তাব দেয় মহিলাকে। মহিলা রাজি হলেন। কিন্তু শয়তানের ইন্ধনে তারা একত্র হতে পারছিল না। তাই যার যার মতো জমি কেনার সিদ্ধান্ত হয়।

পাখোমের ১০০ রুবল আগেই ছিল। তারপর একটি গাধার বাচ্চা ও অর্ধেক মৌমাছি বিক্রি করল সে। ছেলেকেও পাঠিয়ে দিল চাকরিতে। এভাবে বাকি অর্ধেক টাকা জোগাড় হলো। সব টাকা জুটিয়ে সে তিরিশ একর জমি ও ছোট একটি বাগান ক্রয় করল। বেশ, পাখোম হয়ে গেল জমির মালিক। তারপর নতুন জমিতে বীজ বুনল, ফসল ফলল প্রচুর। এক বছরের মধ্যেই সে মহিলার সমস্ত টাকা শোধ করে দিল। এখন সে জমির পুরো মালিক। ঘোড়ায় চড়ে সে জমিজমা দেখতে গিয়ে আনন্দে অভিভূত হয়। গভীর যত্ন আর মায়া দিয়ে সে ফসল ফলাত। তার জমির ঘাসগুলো, ফুলগুলো— সবই যেন আলাদা। মন তার আনন্দে ভরে উঠে।

পাখোমের বাড়িতে অতিথি চাষি

একজন চাষি পাখোমের বাড়ি আসে। পাখোম তাকে থাকতে দেয়, খেতে দেয়। সে জানায়, ভলগার ওপার থেকে সে এসেছে। সে আরও বলে, সেখানে নতুন একটি পত্তনি হয়েছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতে নাম লেখালেই ১০০

একর জমি পাওয়া যায়। আর সে কী জমি! সোনার টুকরো। লোকটি আরও বলে, একজন গরিব চাষি এল। কাজ করার দুখানা হাত ছাড়া কিছুই তার ছিল না। এবার সে ১০০ একর জমিতে শুধু গমই ফলিয়েছে। গত বছর শুধু গম বেচে সে আয় করেছে ৫০০০ রুবল। শুনে পাখোম উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তার বর্তমান সহায়-সম্পত্তি নিয়ে সে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। সুতরাং গরম পড়তেই সে বেরিয়ে পড়ল। ভলগা নদীতে স্টিমারে চড়ে পৌঁছল সামারা। সেখান থেকে প্রায় ২৭৪ মাইল পায়ে হেঁটে পৌঁছল গন্তব্যে। গিয়ে দেখল, যা সে শুনেছে সবই ঠিক। অতি অল্প দামে উর্বর জমি কেনা যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, প্রতি একরের দাম মাত্র ১.৫০ রুবল। পাখোম বাড়িতে ফিরে জমিজিরাত বিক্রি করে দেয়। বসন্তের শুরুতে সে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সেই নতুন দেশে পাড়ি জমায়।

নতুন দেশে পাখোম

নতুন দেশে এসে পাখোম এ সমাজের সদস্য হয়। আর সদস্য হওয়াতেই সে লাভ করে ১০০ একর জমি। গো-চারণ ভূমি তো আছেই। এখানে জীবনযাপন আগের চেয়ে দশগুণ ভালো। পাখোম নতুন নতুন জমি কেনে। ফসল বোনে। লাভ হয় প্রচুর। একবার তো ১০০০ একর জমি মাত্র ১৫০০ রুবলে কিনে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এ সময় একজন মহাজন বাড়িতে এসে উঠে। সে জানায় অনেক অনেক দূরের বাসকিরদের দেশ থেকে সে এসেছে। সেখানে জমির দাম খুবই সস্তা। ১০০০ রুবল দিয়ে সে ১০,০০০ একর জমি কিনেছে। পাখোমকে জমির দলিলটিও দেখাল। লোকটি আরও জানায় যে, মানুষগুলো একেবারে ভেড়ার

মতো সরল। আপনি অনায়াসে যে কোনো জিনিস তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং পাখোম কেন ১৫০০ রুবল দিয়ে ১০০০ একর জমি কিনবে? ঐ রুবল দিয়ে সে তো একজন জমিদারই বনে যেতে পারে।

বাসকিরদের দেশে পাখোম

একজন মজুর সঙ্গে নিয়ে বাসকিরদের দেশে যাওয়ার জন্য যাত্রা করল পাখোম। সঙ্গে নিল কিছু উপহার। প্রায় ৩৩২ মাইল পথ হেঁটে গেল তারা। তারপর সাত দিনের দিন বাসকিরদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলো। মহাজন যেমন বলেছিল সব ঠিক সেরকমই। খোলা প্রান্তরের নদীটির তীরে এরা বাস করে। ঘরবাড়ি নেই। আছে চামড়ার ছাউনি দেওয়া গাড়ি। এর মধ্যেই তাদের বসবাস। এরা জমি চাষ করে না, ফসল ফলায় না। জমিতে চরে বেড়ায় ঘোড়া, গরু, মহিষ। ঘোড়ার দুধ এদের প্রিয় খাদ্য। ভেড়ার মাংসও খায়। দুধ থেকে তৈরি কুসিম তাদের পানীয়। এরা সহজ–সরল, দয়ালু ও হাসিখুশি। পাখোমকে দেখেই তারা গাড়ি থেকে নেমে অভ্যর্থনা জানাল, আদর–আপ্যায়ন করল। পাখোমও তাদের উপহার দিল। বিনিময়ে তারা জানতে চাইল যে পাখোম কী চায়? তারা জানল, পাখোম জমি কিনতে চায়। শুনে তারা অতিথির প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলো। তারা বলল, 'আপনি যত জমি চান তত জমি আমরা বিক্রয় করতে রাজি।' এ সময় তাদের নেতা স্টার্শিনা এসে সবকিছু শুনলেন। তিনিও জানালেন, পাখোম যত খুশি জমি ক্রয় করতে পারে। জমির দাম দিনপ্রতি ১০০ রুবল। 'দিনপ্রতি' ব্যাপারটা পাখোম বুঝে উঠতে পারল না। নেতা জানালেন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবে ততটুকু জমির মূল্য।

পাখোমের স্বপ্ন

পাখোম শুয়েছিল পাখির পালকের বিছানায়। খুব আরামদায়ক। কিন্তু তবু তার ঘুম হয়নি। অনেক জমির মালিক হতে যাচ্ছে সে। ২০,০০০ একর তো বটেই। চিন্তায় উত্তেজনায় সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না। কিন্তু ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়ল। একটা স্বপ্নও দেখল। বাইরে যেন কার হাসির শব্দ। স্বপ্নেই সে বেরিয়ে গেল। দেখল স্টার্শিনা। একটু এগিয়ে দেখল লোকটি স্টার্শিনা নয়, সেই মহাজন। এই লোকটিই তাকে এখানে আসতে বলেছিল। কিছু জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি যেন বদলে গেল। এখন সে ভলগার ভাটি থেকে আসা সেই চাষি। সব শেষে পাখোম দেখল, এ হচ্ছে একটি শয়তান; মাথায় শিং, পায়ে খুর। বিকট শব্দ করে সে হাসছে। অদূরে একটি লোক পড়ে আছে। তার মুখ কাগজের মতো সাদা। লোকটির দিকে তাকিয়ে পাখোম দেখল, লোকটি সে নিজে। তার দম যেন আটকে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ঘুম। চারদিকে ফর্সা হয়ে গেছে। এখনই সূর্য উঠবে। তাকেও জমি–দখলের দৌড় শুরু করতে হবে।

পাখোমের প্রয়োজনীয় জমি

শিকান নামে একটি গোল পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর স্টার্শিনা তার টুপি রাখল। টুপির মধ্যে পাখোমের ১০০ রুবল। এখান থেকেই তার যাত্রা শুরু। পাখোম দেখল সবই উর্বর জমি, সোনার টুকরো। অনেক চিন্তা করে সে সূর্য–উদয়ের দিকে যাত্রা করল। আস্তেও নয়, খুব জোরেও নয়। ১১৬৬ গজ যাবার পর সে একটু থামল। একটি খুঁটি পুতল। এখন সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল। থেমে আর একটি খুঁটি পুতে দিল। সূর্যের দিকে তাকাল একবার। গোল পাহাড়টার উপর আলো পড়েছে। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর

উপরও আলো পড়েছে। হিসাব করে দেখল, প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ হাঁটা হয়েছে। আরও সাড়ে তিন মাইল হেঁটে সে বাঁ–দিকে মোড় নেবে। শরীর তার গরম হয়ে উঠেছে। কোট খুলে ফেলল, জুতাও। হাঁটতে তার খুব ভালো লাগছিল। তাই ভালো ভালো জমি দেখে বাঁক–মোড় নিতে লাগল।

গোল পাহাড়টা এখন আর দেখা যায় না। পাখোম ভাবল : মোড়টা বেশ বড় হয়েছে নিশ্চয়। তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। সে ক্লান্ত বোধ করছে। সে খানিকটা পানি খেল। একটি খুঁটিও পোতা হলো। পথে বড় বড় ঘাস। ভ্যাপসা গরম। তার ভেতর দিয়ে সে ছুটতে লাগল।

ঠিক দুপুরে সে সামান্য রুটি খেল। দাঁড়িয়ে সামান্য জিরিয়েও নিল। মাটিতে সে বসল না। কারণ বসলে শুতে ইচ্ছে হবে, আর শুলে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। রুটি খাওয়ার পর হাঁটতে সুবিধা হলো। কিন্তু সামান্য পরেই তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। কিন্তু শরীরকে আসকারা দিলে চলে না। কেননা সামান্য কষ্টেই তার অনেক লাভ।

সাড়ে ছয় মাইল পথ সে পেরিয়েছে। তার পরও কিছু উর্বর জমি ছেড়ে আসতে পারেনি। কী করে ছাড়ে। চমৎকার তিসি হবে এ জমিগুলোতে। গোল পাহাড় থেকে ১০ মাইল পথ দূরে এসেছে সে। আর পশ্চিম আকাশে সূর্য অনেকটা হেলে গিয়েছে। অথচ সে ফিরতে পেরেছে ১ মাইলের চেয়ে সামান্য বেশি। এখন সে আর কোনো বাঁক নিচ্ছে না। সোজাসুজি হেঁটেও সে যেন এগোতে পারছে না। জুতা সে খুলে ফেলেছিল অনেক আগেই। এখন খালি পা কেটে ছিঁড়ে গিয়েছে। হাঁটতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। শরীর কাঁপছে। পা কাঁপছে। একটু বিশ্রামের বদলে সে সব কিছু দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বিশ্রাম করলে চলবে না। তাই কে যেন চাবুক মেরে মেরে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কত পথ বাকি। অথচ সে মৃত প্রায়। এত পথ সে পেরিয়ে এসেছে। কী করে তা ফিরে যাবে।

কিন্তু ফিরতে তাকে হবেই। সব অর্থ, সব পরিশ্রম বৃথা যেতে পারে না। পা ফেটে রক্ত ঝরছে। তবু সে দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে। তবু যেন এগোতে পারছে না। কোট, জুতা, ফ্লাস্ক, টুপি সব ছুড়ে ফেলে দিল। তবু দৌড়াতে তার দারুণ কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভিতর কে যেন হাপর টানছে। হৃৎপিণ্ডের ভিতরে মারছে হাতুড়ি। পা দুটি দেহের ভার সইছে না, ভেঙে পড়ছে।

জমির কথা সে ভুলে গেল। নিজেকে বাঁচানোই এখন একমাত্র চিন্তা। সূর্য এখন অস্ত যাওয়ার পথে। গোল পাহাড়ের লোকগুলো তাকে ডাকছে। চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সে শেয়ালের চামড়ার টুপিটি মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। তার ভিতরে টাকা। তার পাশে দাঁড়িয়ে স্টার্শিনা। তার স্বপ্নের কথা মনে হলো। তবু সে পৌঁছাতে চায়। নিজেকে সে খুন করেছে। তবু দৌড় বন্ধ করল না। সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন সে পাহাড় ছুঁয়েছে। একটি মুমূর্ষু জন্তুর মতো সে পাহাড় ডিঙিয়ে টুপিটি স্পর্শ করল। স্পর্শ করতে করতে সে নিচে পড়ে গেল।

স্টার্শিনা চিৎকার করে উঠল, 'হায় যুবক, অনেক জমি তুমি পেলে বটে।' পাখোমের মজুর ছুটে গেল তার কাছে। তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। তখন তার মুখ দিয়ে রক্তের ধারা বইছে।

পাখোম মারা গেল। স্টার্শিনা হাসতে লাগল। শেষে সাড়ে তিন হাত জমির মধ্যে পাখোমের সমাধি হলো।

সার–সংক্ষেপ

রাশিয়ার এক গ্রামে পাখোম নামে এক কৃষক বাস করত। তার জমিজমা তেমন ছিল না। ফলে কোনোমতে জীবনযাপন করত। কিন্তু জমির প্রতি তার ছিল বেজায় লোভ। মনে মনে এমন ইচ্ছা পোষণ করত যে যদি সে

জমি পায় তাহলে সে কাউকে পরোয়া করবে না। এমনকি স্বয়ং শয়তানকেও না। তার মনের ইচ্ছার কথা শুনে শয়তান হাসল এবং তাকে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করল। শয়তানের প্ররোচনায় পাখোম ৩০ একর জমি ও একটি বাগান কিনল। সে এই জমিতে ভালোমতো চাষ করে অধিক ফসল পেল। এদিকে শয়তান মানুষের রূপে তার কাছ এসে জানাল যে ভলগা নদীর ওপারে জমি খুবই সস্তা এবং খুব ভালো। আরও মজার ব্যাপার হলো, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হলেই ১০০ একর জমি পাওয়া যায়। জমি পাওয়ার এই লোভ সামলাতে না পেরে পাখোম ওখানে চলে গেল এবং বসবাস শুরু করল। এরপর শয়তান তাকে আরও প্রলোভন দেখাল। বলল, পাশের দেশে জমি আরও সস্তা এবং আরও উর্বর। পাখোম শয়তানের প্ররোচনায় এবারও ওখানে চলে গেল এবং বসবাস শুরু করল। তারপর জমি কিনতে গিয়ে জানল যে দিনপ্রতি জমির মূল্য ১০০ রুবল। দিনপ্রতি বলতে একদিনে সে যতটুকু জমি হাঁটতে পারবে ততটুকুই তার হয়ে যাবে। সে জমির লোভে সারাদিন প্রাণপাত করে হাঁটল। একটুও অবসর নিল না। ফলে তার শরীর এত খারাপ হলো যে, সে আর স্থির থাকতে পারছিল না। অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছে সে মারা গেল। জমির প্রতি অতিলোভ তার মৃত্যুর কারণ হলো।

শব্দার্থ

মাটির কোলে – গ্রামে থাকা।
পরোয়া – ভয় না–করা বা ভয় না–পাওয়া।
একর – ১০০ শতাংশ পরিমাণ জমি।
ওভারশিয়ার – বিষয়–সম্পত্তি দেখাশোনা করে যে।
ছলছুতা – নানা কৌশল।
জমিজিরাত – জায়গাজমি।
সিদ্ধান্ত – কোনো বিষয়ে ঐকমত্য।
রুবল – রাশিয়ার মুদ্রার নাম।
জোগাড় – আয়োজন, ব্যবস্থা, সংগ্রহ, আহরণ।
অভিভূত – আচ্ছন্ন, বিহ্বল।
অতিথি – মেহমান, আগন্তুক।
ভলগা – রাশিয়ার একটি বিখ্যাত নদীর নাম।
স্টিমার – একধরনের জলযান।
গন্তব্য – উদ্দেশ্য, লক্ষ্যস্থল।
উর্বর – অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম।
অবিশ্বাস্য – বিশ্বাসের অযোগ্য, বিশ্বাস করা যায় না এমন।
পত্তনি – নির্ধারিত করে দেওয়ার নিয়মে যে ভূসম্পত্তি গ্রহণ করা হয়েছে।
পঞ্চায়েত – গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিচারসভা; গ্রামের পাঁচজনের বৈঠক।

গো–চারণ ভূমি – গবাদি পশু চরে বেড়ায় যেখানে।

বাসকিরদের দেশ – রাশিয়ার কোনো জাতির আবাসভূমি।

বাগিয়ে নেওয়া – কৌশলে আয়ত্ত করা, কৌশলে লাভ বা আদায় করা।

অনায়াসে – অল্প পরিশ্রমে, সহজে।

জমিদার বনে যাওয়া – জমিদার হওয়া, অনেক ভূসম্পত্তির মালিক হওয়া।

মজুর – শ্রমিক।

কুসিম – একধরনের পানীয়।

অভ্যর্থনা – সাদরে গ্রহণ, সংবর্ধনা, আপ্যায়ন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঘোড়ায় চড়ে সে জমিজমা দেখতে গিয়ে আনন্দে অভিভূত হয়। তার জমির ঘাসগুলো, ফুলগুলো সবই যেন আলাদা। মন তার আনন্দে ভরে ওঠে।

১. এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

ক. ওভারশিয়ারের	খ. জমিদারের

গ. পাখোমের	ঘ. একজন চাষির

২. তার মন আনন্দে ভরে ওঠার কারণ কী?

ক. তার জমির ঘাস দেখে	খ. তার জমির ফসল দেখে

গ. প্রচুর ফসল ফলায়	ঘ. জমির মালিক হওয়ার আত্মতৃপ্তিতে

৩. একজন মজুর সঙ্গে নিয়ে প্রায় ৩৩২ মাইল পথ পায়ে হেঁটে সাত দিনের দিন পাখোম বাসকিরদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলো। তার সাথে ছিল ১০০ রুবল। বাসকিরদের দেশে জমি ছিল–

i. সস্তা

ii. ভালো

iii. উর্বর

নিচের কেনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গোল পাহাড়ের লোকগুলো তাকে ডাকছে। চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সে শেয়ালের চামড়ার টুপিটি মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। তার ভেতরে টাকা। তার পাশে দাঁড়িয়ে স্টার্শিনা। তার স্বপ্নের কথা মনে হলো। তবু সে পৌঁছতে চায়। নিজেকে সে খুন করছে। তবু দৌড় বন্ধ করল না। সূর্য যখন অস্ত গেল তখন সে পাহাড় ছুঁয়েছে। একটি মুমূর্ষু জন্তুর মতো সে পাহাড় ডিঙিয়ে টুপিটি স্পর্শ করল। স্পর্শ করতে করতে সে নিচে পড়ে গেল। স্টার্শিনা চিৎকার করে উঠল, 'হায় যুবক, অনেক জমি তুমি পেলে বটে।' পাখোমের মজুর ছুটে গেল তার কাছে। তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। তখন তার মুখ দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। পাখোম মারা গেল। স্টার্শিনা হাসতে লাগল। শেষে সাড়ে তিন হাত জমির মধ্যে পাখোমের সমাধি হলো।

ক. উদ্দীপকের অংশটি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. পাখোমের মনের ইচ্ছা কী ছিল– বর্ণনা কর।

গ. পাখোমের শেষ পরিণতির জন্য দায়ী কী?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'শেষে সাড়ে তিন হাত জমির মধ্যে পাখোমের সমাধি হলো'–উক্তির মর্মকথা বিশ্লেষণ কর।

২. এক চাষির একটি রাজহাঁস ছিল। হাঁসটি প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম পাড়ত। ফলে অল্প দিনেই চাষির ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। কুঁড়েঘরের পরিবর্তে এখন সে বড় বড় টিনের ঘর–বাড়ির মালিক হয়ে গেল। চাষির আরও বড় লোক হওয়ার ইচ্ছা হলো।

রাতারাতি বড় লোক হওয়ার জন্য এক দিন সে হাঁসটিকে জবাই করল। কিন্তু হায়! একি! হাঁসের পেটে কোনো ডিম নেই। চাষি মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে লাগল, আমি এ কী করলাম!

ক. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন গল্পের মিল পাওয়া যায়?

খ. উদ্দীপকের মূল বক্তব্য কী?

গ. উদ্দীপকে চাষির সিদ্ধান্তের সাথে পাখমের সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে– তুমি কি একমত? যুক্তি দেখাও।

ঘ. পাখোমের জীবনের পরিণতির জন্য লোভই দায়ী–মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০১৭

শিক্ষাবর্ষ

৮-আনন্দপাঠ

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য